শাহাদত চৌধুরী ও আমাদের তারুণ্য

হাশেম খান

১৯৬৯-এর ঐতিহাসিক গণআন্দোলনের এক শক্তিশালী হাতিয়ার হিসেবে প্রকাশিত হয়েছিল এই ছড়া সংকলন। শামসুর রাহমান, সৈয়দ শামসুল হক, আল মাহমুদ, ফয়েজ আহমেদ থেকে শুরু করে তৎকালীন তরুণতম ছড়াকার ও কবি- যারা স্বৈরাচারী পাক- সরকারের রক্তচক্ষু ও দমন পীড়নকে উপেক্ষা করে লিখছে- রাস্তায় রাস্তায় আন্দোলন ও মিছিলে নেতৃত্ব দিচ্ছে, তাদের অসংখ্য তেজদীপ্ত ও সঙ্কট-সমাধান বিবৃত ছড়ার সংগ্রহ ছিল সংকলনে। এমন একটি ছড়া গ্রন্থের পুরো পরিকল্পনা ও সম্পাদনা ছিল শাহাদত চৌধুরীর। শাহাদত তখন সদ্য চারুকলা থেকে স্নাতক এক টগবগে তরুণ। ছড়া সংগ্রহে ও কার্টুন এঁকে তাকে সহযোগিতা করেছিল আরেক তরুণ- শিল্পী রফিকুন নবী। যদিও ছড়া গ্রন্থটিতে পরিকল্পক ও সম্পাদক হিসেবে এদের কারো নামই ছাপা হয়নি। শুধু ছাপা হয়েছিল 'চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদ কর্তৃক প্রকাশিত।'

ঊনসত্তুরের গণআন্দোলনের বিভিন্ন কর্মকান্ডে সে সময়ের চারুকলার ছাত্ররা ও আমরা দুই তরুণ শিক্ষক (রফিকুন নবী ও আমি) প্রত্যক্ষ বা কখনো পরোক্ষভাবে জড়িয়ে পড়েছিলাম। ছাত্র ইউনিয়ন, ছাত্রলীগ, আওয়ামী লীগ ও কম্যুনিস্ট পার্টির পোস্টার, ফেস্টুন ও মঞ্চসজ্জার কাজে এবং সাংস্কৃতিক আন্দোলন ও অনুষ্ঠানে আমরা আনন্দের সঙ্গে সক্রিয়। শাহাদত চৌধুরী কখনো আমার সঙ্গে, কখনো রফিকুন নবীর পাশে প্রায় সার্বক্ষণিক সঙ্গী। চারুকলার ছাত্রদের নানারকম আন্দোলন-সংগ্রামের পরিকল্পনা এবং তা যথাযথভাবে বাস্তবে রূপ দেয়ার বিষয়ে শাহাদতের মেধা ও পরামর্শ সর্বতোভাবে গ্রহণযোগ্য ও যথাযথ হিসেবে বিবেচিত হতো।

ঊনসত্তুরের গণআন্দোলনে একুশে ফেব্রুয়ারি উদ্‌যাপন ছিল আন্দোলন ও সংগ্রামের এক শক্তিশালী পদক্ষেপ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রিক ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ও চারুকলার ছাত্র সংসদের যৌথ উদ্যোগে শহীদ মিনার চত্বরে দুঃখিনী বর্ণমালা নামে (মতান্তরে বিক্ষুব্ধ বর্ণমালা) চিত্র প্রদর্শনীর যে বিশাল আয়োজন হয় তা যথাযথভাবে বাস্তবে রূপ দিতে তরুণ শিল্পকর্মী শাহাদতের পরামর্শ ও মেধা বয়োজ্যেষ্ঠ শিল্পী, সাংস্কৃতিক কর্মী ও সংগ্রামী নেতাদের আকৃষ্ট করে, মুগ্ধ করে। দুঃখিনী বর্ণমালার বিষয়টি বিন্যস্ত করা, প্রতিটি বর্ণের সঙ্গে দু' লাইনের অর্থবহ ছড়া তৈরি করে কোনো শিল্পী কোন বিষয়ে আঁকবেন, বর্ণমালার ছড়ায় উপযুক্ত শব্দচয়নসহ

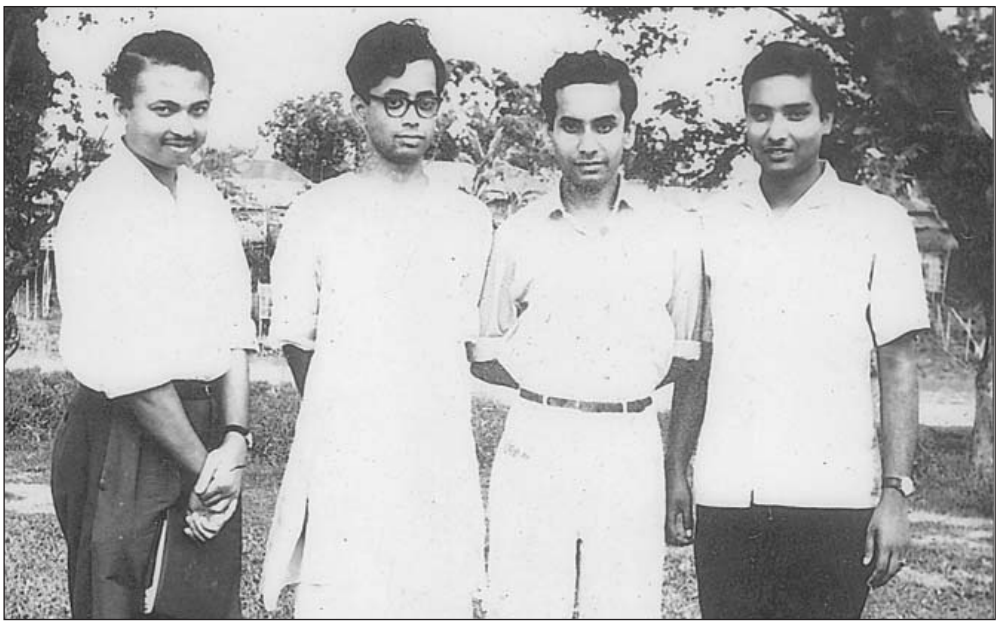

ষাটের দশকের চার তারুণ্য- বাঁ দিক থেকে হাশেম খান, শাহাদত চৌধুরী, শামসুজ্জামান খান ও মাহবুব তালুকদার- কচি-কাঁচার মেলা গড়ে তোলার পেছনে দাদাভাই-এর শক্ত ও বিশ্বস্ত হাত

পুরো প্রদর্শনীটি যাতে আন্দোলনের শক্তিশালী বিষয় হিসেবে সাধারণ মানুষের কাছে আদৃত হয় সেদিকেই সবাইকে সচেতন করে তোলেন। সরকারি চাকরি করা সত্ত্বেও বিপদের ঝুঁকি নিয়ে আমি, রফিকুন নবী, ইমদাদ হোসেন, মোস্তফা মনোয়ার যেমন ছবি এঁকেছি, চারুকলার ছাত্রদের নিয়ে শাহাদত চৌধুরী শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন, রশীদ চৌধুরী ও আমিনুল ইসলামের মত শিল্পীদেরকে সেই প্রদর্শনীর জন্য ছবি আঁকিয়ে সম্পৃক্ত করতে পেরেছিল। উন্মুক্ত পরিবেশে জনসাধারণের জন্য সেই প্রদর্শনীটি প্রথম প্রদর্শনী ছিল।

পুরো ষাটের দশক ও পঞ্চাশের দশকের শেষ চার বছর শাহাদত আমার নিত্যদিনের সঙ্গী। প্রায় সার্বক্ষণিক। ৩০ হাটখোলা রোডের গাছ-গাছালী ভর্তি একতলা বাড়ির চিলেকোঠায় শাহাদতের আস্তানা। একটি বিছানা- যার চারদিকে ছড়ানো ছিটানো অসংখ্য বই- দেয়ালের শেল্‌ফে ঠাসা বই- সাহিত্য, সংস্কৃতি, দর্শন, রাজনীতি ও দেশবিদেশের থ্রিলার। ইংরেজি, বাংলা ম্যাগাজিনের স্তূপ তার খাটের নিচে, মেঝেতে। বই পড়ার নেশা শৈশব থেকেই। তাই যখনই সুযোগ ঘটে, বই পড়ে। বই সংগ্রহ করে। সেই সময়ে খেলতে গিয়ে চোখে প্রচন্ড আঘাত পায়। ফলে একটি চোখের কর্ণিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অন্য চোখেও সে কারণে যথাযথ দৃষ্টিশক্তি পেতে অসুবিধা হতো। লিখতেও খুব অসুবিধা হতো। তাই দশম শ্রেণীতে উঠে ম্যাট্রিক (বর্তমান এসএসসি) পরীক্ষার জন্য তাকে প্রায় চার বছর অপেক্ষা করতে হয়। এই চার বছর শাহাদতের জীবনে মূল্যবান সময়। জীবন, মানুষ ও বিশ্বব্যাপী নানারকম বিষয়ে তার কিশোর বয়সের অনেক কৌতূহল ও জিজ্ঞাসার সমাধান খুঁজে পায় বই পাঠের মাধ্যমে। প্রচুর বই পড়েছে এই চার বছর। চোখের অসুস্থতা, চোখে প্রচন্ড চাপ পড়ছে জেনেও বইকেই তার আনন্দ হিসেবে গ্রহণ করে। অন্য দিকে বাড়িতেও ছিল বই পড়ার পরিবেশ। সেই সময়ে অর্থাৎ পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে মধ্যবিত্ত সব পরিবারে পাঠ্য বইয়ের বাইরে অন্য বই অর্থাৎ গল্প উপন্যাস পাঠ বেশির ভাগ অভিভাবকরা ভালো চোখে দেখতো না। মনে করতো পাঠ্য ছাড়া বাইরের বই পড়ে ছেলে মেয়েরা বখে যাবে। কিন্তু সেদিক থেকে শাহাদত চৌধুরী ছিল ভাগ্যবান। ওদের বাড়ির পরিবেশ ছিল মুক্ত, প্রগতিশীল ও আধুনিক। বাবা আবদুল হক চৌধুরী জেলা জজ। শত ব্যস্ততার মধ্যেও বিভিন্ন বিষয়ে বই পড়াকে আধুনিক সংস্কৃতি বলে মনে করতেন। মা জাহানারা বেগমও তাই। বড় ভাই জাহান আলী চৌধুরী পঞ্চাশের দশকের সাড়া জাগানো সাংস্কৃতিক আন্দোলনের প্রতিষ্ঠান অগ্রণী শিল্পী সংসদ গড়ে তুলে ৩০ হাটখোলা রোডেই অফিস করলেন। বায়ান্নোর ভাষা আন্দোলনে অগ্রণী শিল্পী সংসদের সদস্যদের প্রত্যক্ষ ভূমিকা ছিল। সংবাদ পাঠক কাফি খাঁ, নৃত্য শিল্পী গওহর জামিল, রওশন জামিল, অভিনেতা গোলাম মুস্তাফা- এমনি অনেকেই ছিল জাহান আলীর বন্ধু। বাম আন্দোলন বা কম্যুয়ুনিস্ট পার্টির বেশ কিছু গোপন সভা এ বাড়িতেই হয়েছে। যেখানে কমরেড মনি সিং, ভাষা সৈনিক আবদুল মতিন ও এঁদের মতো অনেকেই এসেছেন। অন্যদিকে বাবার কাছেও আসতেন অনেক ঝানু রাজনীতিবিদ, আইনের লোক। বড়বোনের (আমাদের সবার শান্তি আপা) বিয়ে হয়েছে জয়নুল আবেদিনের প্রিয় ছাত্র শিল্পী সৈয়দ শফিকুল হোসেনের সঙ্গে। যিনি ইংরেজি সাহিত্যে অনার্স ও মাস্টার্স করে পরে গভর্নমেন্ট আর্ট ইনস্টিটিউটের ৫ বছরের কোর্স শেষ করে আমিনুল ইসলাম, মোর্তজা বশীর প্রমুখের সমসাময়িক শিল্পী। অনেক পরে এই সৈয়দ শফিকুল হোসেনই চারুকলা মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ হয়েছিলেন। (১৯৭০ থেকে ১৯৭৪)। তাই শৈশব থেকেই শিক্ষা ও সংস্কৃতির একটা শক্ত ভিত থেকে ধীরে ধীরে নিজেকে তৈরি করে নিতে পেরেছিল শাহাদত চৌধুরী।

১৯৫৬ সালে কেন্দ্রীয় কচি-কাঁচার মেলার প্রতিষ্ঠা হলে একেবারে প্রথম দিক থেকে শাহাদত চৌধুরী এই আন্দোলনে নিজকে সঁপে দেয়। আমিও প্রতিষ্ঠার প্রথম দিন থেকেই কচি-কাঁচার সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ি। সে সময় যেসব শিশু, কিশোর, তরুণ কচি-কাঁচার মেলায় যুক্ত হয় তারা আজ অনেকেই স্ব স্ব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত ও খ্যাতিমান। এরা হলো শাহাদত চৌধুরীসহ মাহবুব তালুকদার, সৈয়দ শাহজাহান, মহিউদ্দিন মনসুর, এটিএম শামসুল হুদা, আবদুস সামাদ, জালাল আহমেদ, এম এ মবিন, কেরামত মাওলা, শামসুজ্জামান খান, আতাউর রহমান, ফরিদ আলী, মোফাবেজা খানম, হাসি সিদ্দিকী, আলী আসগর (পরে লন্ডনবাসী) আনোয়ারা সৈয়দ হক, আসমা আব্বাসী, মাহফুজা খানম, মোহাম্মদ মোস্তফা, খন্দকার ইব্রাহিম খালেদ, রবিউল, শামসুল, রুবী রহমান, আমজাদ হোসেন, আলী ইমাম, শোয়েব কামাল, শীলব্রত চৌধুরী, সাজেদ কামাল, সুলতানা কামাল, সাঈদা কামাল, ফরিদুর রেজা সাগর, বুলবুল মহলানবীশ, পাপিয়া রহমান, আবুল বারক আলভী, মিনু হক (বিল্লাহ), শিমুল ইউসুফ (বিল্লাহ), লিনু বিল্লাহ, লুৎফর রহমান রিটনসহ আরো অনেকে। কচি-কাঁচার মেলায় আমরা সবাই মিলে একটি পরিবার। সুফিয়া কামাল, অজিত গুহ, আবদুল ওয়াদুদ, আবদুল্লাহ আলমূতী, মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন, শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন, হাসান জান, নূরজাহান বেগম- এমনি সব আলোকিত মানুষেরা রোকনুজ্জামান খান দাদাভাইয়ের নেতৃত্বে শিশু কিশোরদের প্রগতিশীল ও অসাম্প্রদায়িক সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার উদ্দেশ্য নিয়ে কচি-কাঁচার মেলাকে সংগঠিত করেছিলেন।

কচি-কাঁচার মেলা করতে এসেই শাহাদতের সঙ্গে পরিচয় এবং যেহেতু চিন্তায়, মানসিকতায় দু'জনের সঙ্গে অনেক কিছুতেই মিলে গিয়েছিল তাই বন্ধুত্ব হয়ে যায় কয়েক দিনের মধ্যেই। ওর মত আমার বই পড়ার নেশা। অন্যদিকে আমি যেহেতু আর্ট কলেজে পড়ি- ছবি আঁকার প্রতি শাহাদতেরও প্রবল ইচ্ছা, ওর দুলাভাই একজন শিল্পী। চিলেকোঠায় বসে আমরা নানারকম গল্প জুড়ে দিতাম। বিষয় ছিল- কোন কোন লোকের বই পড়েছি, কোনটা ভালো লেগেছে, কেন ভালো ইত্যাদি। ছবি আঁকার বিষয়েও গল্প হতো। একদিন গল্পচ্ছলে শাহাদত জিজ্ঞেস করেছিল মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদ্মানদীর মাঝি পড়েছি কিনা? বললাম- হ্যাঁ পড়েছি। তারপর জানতে চাইলো উপন্যাসের কোন চরিত্র আপনার কাছে উল্লেখযোগ্য মনে হয়েছে। আমি একটু চিন্তা করলাম। তারপর হেসে বললাম- এমন একটি বিশেষ চরিত্র যা আমার কাছে অসাধারণ বলে মনে হয়েছে। একটু আম্‌তা আম্‌তা করে বললাম- অনেকের কাছেই এই চরিত্র অনুল্লেখযোগ্য মনে হতে পারে কিন্তু তুমি কীভাবে নেবে জানি না।

- বলুন বলুন- শাহাদত আরো কৌতূহলী হয়ে উঠলো। বললাম-

- হোসেন মিয়া। তারপর কুবের- তারপর...

- হোসেন মিয়া! শাহাদতের চোখে বিস্ময়।

কিছুক্ষণ আমার দিকে স্থির দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে থেকে বললো-

- এতো লোক থাকতে হোসেন মিয়া কেন?

- হোসেন মিয়া বহুদূরে এক বিরান চরে মানুষ নিয়ে যাচ্ছে। গভীর পানি, ঝড় ঝঞ্ঝা, ঢেউ পাড়ি দিয়ে অনেক কষ্টে পৌঁছাতে হয় দ্বীপে। সমাজের প্রায় ফেলনা গরিব মানুষ, পুরুষ মেয়েলোক সে দ্বীপে নিয়ে গিয়ে এক নতুন মানব সমাজ গড়ে তুলবে- বসতি গড়ে তুলবে। তার স্বপ্ন- একটি নতুন জনপদ- সম্পূর্ণ ভিন্নরকম।

আমার কথাগুলো শুনতে শুনতে শাহাদতের চোখ মুখ দীপ্ত আলোকে উদ্ভাসিত মনে হলো। তার স্বভাবসুলভ আচরণ- উল্লাস প্রকাশে প্রায় চিৎকার করে হৈ চৈ করে উঠলো-

- একদম আমার চিন্তার সঙ্গে, ধারণার

সঙ্গে মিলে গেছে হাশেম ভাই। একটা নতুন দেশের স্বপ্ন হোসেন মিয়ার? পেছনের জীবন ভুলে গিয়ে নতুনভাবে জীবন বাঁধবে- পুরনো ধর্ম ম্লান হয়ে মানবধর্ম এগিয়ে নিয়ে যাবে মানুষদের- সম্ভব হবে কিনা তা সে জানে না। কিন্তু স্বপ্ন দেখতে ক্ষতি- চেষ্টা করে দেখা যাক। এই তো হোসেন মিয়া।

একটু থেমে যোগ করলো-

- জানেন? অন্তত ১৪/১৫ জন বইপড়ুয়াকে জিজ্ঞেস করেছি। কিন্তু কেউই হোসেন মিয়ার কথা বলেনি। আপনার সঙ্গে আমার চিন্তা একদম মিলে গেছে। হোসেন মিয়ার মত আমারও স্বপ্ন দেখতে ইচ্ছে করে। নতুন কিছু করার স্বপ্ন। কিন্তু সেটা যে কি তা এখনো বুঝতে পারছি না।

নেত্রকোনা- ১৯৬৩ কচি-কাঁচার মেলার সাংগঠনিক ও সাংস্কৃতিক সফরে বামদিক থেকে আলোকচিত্রি আজিজুর রহমান, শাহাদত চৌধুরী, লিনু বিল্লাহ (চমৎকার তবলা বাজাতো) শামসুজ্জামান খান, সুলতানা কামাল, রোকনুজ্জামান খান- দাদাভাই, সাঈদা কামাল- পেছনেই নুরজাহান বেগম- সামনের শিশুটি শিমুল। বিল্লাহ, মিনু বিল্লাহ, মিতু (দাদাভাইয়ের ছোট মেয়ে) এদের পেছনে সুফিয়া কামাল, সাবিহা ও বুলবুল মহলানবিশ, পেছনে মাহবুব তালুকদার, আবুল বারক আলভী, এরপর ৩ জনের পর সর্বডানে হাশেম খান। প্রায় সবার মাথায় কচি-কাঁচার মেলার টুপি

এই নতুন কিছু করার স্বপ্ন, সৃষ্টিশীল কাজ যা মানব কল্যাণে আসবে এমনি সব চিন্তা ও স্বপ্ন আমার মধ্যেও ছিল বলে শাহাদতের সঙ্গে আমার অন্তরঙ্গতা দিন দিন দৃঢ় হতে থাকে। কচি-কাঁচার মেলার বিভিন্ন রকম কাজ- সাহিত্য সভা, আনন্দানুষ্ঠান, চিত্র প্রদর্শনী, পাঠাগার তৈরি, দু'জনে নিষ্ঠা নিয়ে সমাধান করতাম। তাই পরিচালক দাদাভাইয়ের আস্থাভাজন হতে খুব দেরি হয়নি দু'জনের। ১৯৫৬-এর শুরু থেকে ষাটের দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত শাহাদত ও আমি দাদা ভাইয়ের প্রতিদিনের সঙ্গী। কচি-কাঁচার মেলার সব রকম কাজে আমরা দু'জন হাতে হাত মিলিয়ে দাদাভাইকে সহযোগিতা করে যাচ্ছি। দাদা ভাইয়ের আস্থাভাজন আমাদের বন্ধুরা আরো অনেকেই ছিলেন।

শাহাদতের চিলেকোঠা আমাদের এক আকর্ষণীয় আড্ডার জায়গা হয়ে দাঁড়ালো। আরো যারা এই আড্ডায় সঙ্গী তারা হলো- মাহবুব তালুকদার, শেখ আবদুর রহমান, বুলবন ওসমান, শীলব্রত চৌধুরী, রফিকুন নবী ও শামসুজ্জামান খান। শেখ আবদুর রহমান (ছোট গল্পের লেখক) খুব অল্প বয়সেই বিয়ে করেছিল এবং 'ইউসিস'-এ চাকরি করতো। শাহাদতকে, পরে আমাকেও প্রচুর বই জোগাড় করে দিতো পড়ার জন্য। আর্ডিংস্টোনের 'লাস্ট ফর লাইফ' বইটি সেই প্রথম জোগাড় করে দেয় দু'জনকে। শাহাদত ও আমার দু'জনের কাছেই উপন্যাসটি প্রিয় বই ছিল। অনেক পরে ষাটের দশকের মাঝামাঝি শাহাদত এটিকে নাট্যরূপ দিয়েছিল বাংলায়। চারুকলায় আমরা দু'জন এটিকে অভিনয়ের রিহার্সাল দেই বেশ কিছুদিন। শিল্পী মহিউদ্দিন ফারুককে ঠিক করেছিলাম ভ্যানগগের চরিত্রে। তার এই নাট্যরূপ দেয়া 'লাস্ট ফর লাইফ' এখনো খুঁজে পেলে- অনবদ্য একটি অনুবাদ-সাহিত্য হিসেবে বিবেচিত হতে পারতো।

শাহাদতের চিলেকোঠার আড্ডাটি পরে ধীরে ধীরে চলে আসে কচি-কাঁচার মেলার অফিসে- দৈনিক ইত্তেফাক ভবনের নিচতলার দুটি কামরায়। অতি যত্নে একটি কামরায় গড়ে তোলা হয় শিশু-কিশোরদের জন্য চমৎকার একটি পাঠাগার- কাকলী পাঠাগার। সেখানেও শাহাদতের কুশলী হাতের স্পর্শ উল্লেখযোগ্য।

দাদাভাই, সুফিয়া কামাল ও আবদুল্লাহ আলমুতী এঁরা কচি-কাঁচার মেলাকে একটি আদর্শ শিশু সংগঠন হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষে আমাদের নিয়ে সারা বাংলাদেশ ঘুরে বেড়িয়েছেন ষাটের দশকে। বস্তুত ষাটের দশক ছিল কচি-কাঁচার মেলার বিকাশের দশক- স্বর্ণযুগ। শিশু-কিশোরদের উৎসাহিত করার জন্য দেশের খ্যাতিমান কবি-সাহিত্যিক, বিজ্ঞানী ও শিল্পীদের নিয়মিতভাবেই মেলায় নিয়ে আসা হতো। আর শাহাদত চৌধুরীসহ আমরা কয়েকজন ছিলাম দাদাভাই রোকনুজ্জামান খানের শক্ত ও বিশ্বস্ত হাত। এ সময় শাহাদত চৌধুরী ইত্তেফাকের কচি-কাঁচার আসর পরিচালনায় দাদা ভাইয়ের সহকারীর দায়িত্বও পালন করে বেশ অনেক দিন।

আমি সে সময় থেকেই ইত্তেফাকের চিত্রশিল্পী হিসেবে ইলাস্ট্রেশন ও শিল্পকর্ম শুরু করেছি। শাহাদত আমাকে সে সময় নানাভাবে সহযোগিতা করতো। আমার ছবি আঁকায় যেমন প্রশংসা করতো- তেমনি ইলাস্ট্রেশন, ড্রইং ইত্যাদি পরিশীলিত ও আকর্ষণীয় করার জন্য নানারকম পরামর্শ দিত। ইত্তেফাকের সাংবাদিকদের কাছে আমরা দুই তরুণ নানা কারণে আদৃত হতাম। সেই সময়ের জাঁদরেল সাংবাদিকরা বেশির ভাগই কাজ করতেন ইত্তেফাকে। সিরাজউদ্দিন হোসেন, নূরুল ইসলাম পাটোয়ারী, এহতেশাম হায়দার চৌধুরী, রেজা মুহাম্মদ আসফদ্দৌলা, আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী, মিজানুর রহমান, খন্দকার আবু তালেব প্রমুখ। এঁরা আমাদের দু'জনকে স্নেহ করতেন। কেউ কেউ সম্বোধন করতেন দাদাভাইয়ের দুই সেনাপতি। কেউবা দুই সাগরেদ। শাহাদতের একটি গুণ ছিল যতো বয়োজ্যেষ্ঠই হোক খুব সহজে সেই ব্যক্তির গুণাগুণ বিষয়ে নানারকম বুদ্ধিদীপ্ত প্রশ্ন করে নিজের প্রতি গুণীজনের দৃষ্টি ফেরাতে পারতো। আকর্ষণ করতে পারতো- স্নেহ কুড়াতে পারতো। এমন কি খুব রাশভারী মানুষের সঙ্গেও সহজে মিশতে পারতো। আমরা দুজনেই তাদের অনেক লেখার, নিয়মিত ফিচারের ভক্ত পাঠক ছিলাম। যেমন নূরুল ইসলাম পাটোয়ারীর 'কাগজে মানুষের' জন্য আমি নিয়মিত ইলাস্ট্রেশন করতাম। পড়ে মতামত জানাতাম। পাটোয়ারী সাহেব শাহাদতের মতামত শোনার জন্য আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করতেন। একদিনের ঘটনা শাহাদত ও আমি ইত্তেফাকের নিউজ সেকশনে ঢুকতেই সিরাজউদ্দিন হোসেন আমাদের ডাকলেন। শাহাদতের হাতে খবর লেখা দুটি পাতা ধরিয়ে দিয়ে বললেন- তোদের চারুকলার ছাত্রদের খবর। ভেতরের পৃষ্ঠায় ছোট করে ছাপা হবে। তাই যত ছোট করে

পারিস লিখে দে। শাহাদত নতুন করে লিখে দিলে সিরাজউদ্দিন পুরোটা পড়ে উল্লসিত হয়ে উঠলেন- করেছিস কী, এ যে অসাধারণ খবর হয়ে গেল। আশপাশের কয়েকজনকে পড়ে শোনালেন। তারপর আবার শাহাদতের হাতে দিয়ে বললেন, খবরটার শিরোনামটাও তুই ঠিক করে দে। শাহাদত বেশ খুশি হয়ে ঝটপট লিখে দিল 'সারমেয় সংবাদ'।

পরের দিন ইত্তেফাকের প্রথম পৃষ্ঠায় প্রধান ২টি খবরের মধ্যে এক নম্বরটি ছিল 'সারমেয় সংবাদ'। যা ছিল একটি সাধারণ খবর। শাহাদতের মেধা ও রাজনৈতিক চেতনাদীপ্ত লেখনীতে একটি অসাধারণ খবরে পরিণত হয়ে জনপ্রিয় দৈনিকের প্রধান খবর হতে পেরেছিল। খবরটি ছিল- সে সময়ে ঢাকা শহরে কুকুরের সংখ্যা অধিক হারে বেড়ে যাওয়ায় রাতের বেলা তাদের ঘেউ ঘেউ ছুটাছুটিতে নিউ মার্কেট, আজিমপুর, ধানমন্ডি এলাকার মানুষের সারা রাতের ঘুম হারাম। চারুকলার হোস্টেলে ছাত্ররা রাত একটা থেকে ভোর চারটা পর্যন্ত ঝাড়ু, বাঁশের লাঠি, মশারীর লাঠি ইত্যাদি নিয়ে পুরো এলাকা হৈ চৈ করে কুকুর তাড়িয়েছে- সে এক এলাহী কান্ড- ইত্যাদির রসালো বর্ণনা। কিন্তু শেষ করেছে যে মন্তব্য দিয়ে সেটিই হলো উল্লেখযোগ্য। পাক সরকার ঢাকা শহরের ও অন্যান্য জায়গার কুকুর নিধনের জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করে অনেক গাড়ি, সাঁড়াশীর মত যন্ত্র, পুলিশের একটি বাহিনীকে বিশেষ ট্রেনিং দিয়ে তৈরি করলেও কয়েকদিন কাজ করে দীর্ঘদিন ধরে সেই 'সারমেয়' নিধন বাহিনী নিশ্চুপ। তাই 'সারমেয়'দের সংখ্যা দিন দিন বেড়ে চলেছে। সম্ভবত সেই সারমেয় নিধন বাহিনীকে এখন সারমেয়দের পেছনে না লাগিয়ে ধরা হচ্ছে স্বৈরাচারী বিরোধী আন্দোলনকারী ছাত্রদের ও জনগণকে। সম্প্রতি কয়েকটি মিছিলে পুলিশ বাহিনী আন্দোলনকারীদের যেভাবে হামলা করেছে এবং ধরে, টেনে হেঁচড়ে গাড়িতে তুলে নিয়ে গিয়েছে এখন তারই আলামত দেখা যাচ্ছে।

শাহাদত চৌধুরী তার সেই তরুণ বয়সেই অনেকগুলো চমৎকার গল্প লিখেছিল। বেশির ভাগই প্রকাশিত হয়েছে ইত্তেফাকের সাহিত্য সাময়িকীতে। ছোট গল্পকার হিসেবে সেই সময়েই শাহাদত পরিচিত হয়ে ওঠে। আজ অনেকেই সে কথা জানে না। কিন্তু শাহাদত গুণ থাকা সত্ত্বেও এক সময় লেখা বন্ধ করে দিল।

ষাটের দশকের মাঝামাঝি থেকে আমাদের তরুণ লেখক, শিল্পী, সাংবাদিকদের আড্ডার প্রধান কেন্দ্র হয়ে দাঁড়ালো আমার গোপীবাগের ৩নং গলির ২৫ নং বাড়ি। শাহাদত সেখানে নিত্যদিনের সদস্য। রফিকুন নবী, মাহবুব তালুকদার, বুলবন ওসমান, আবুল বারক আলভী, মনজুরুল হাইসহ অনেক লেখক-শিল্পীদের জমজমাট আড্ডা গোপীবাগের

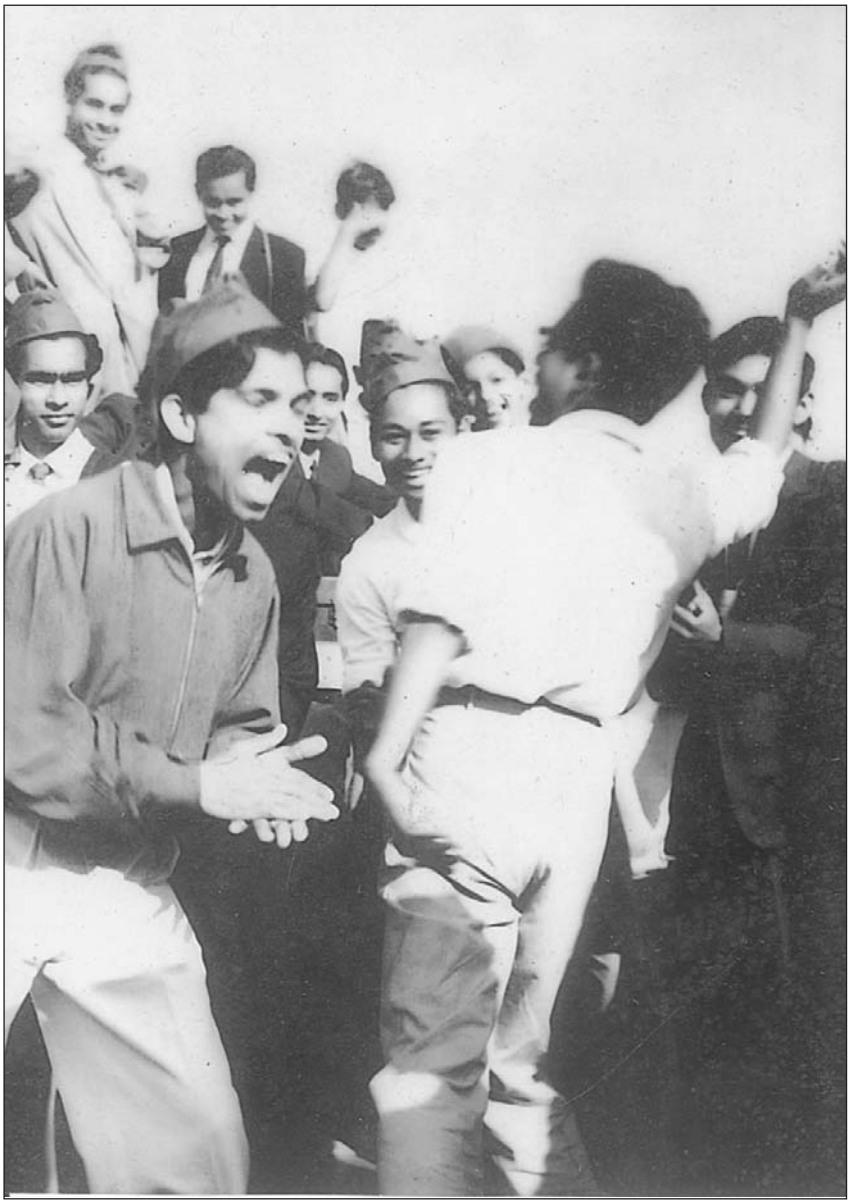

পেছন দিক থেকে শাহাদত চৌধুরী আনন্দে গান গাইছেন- বাঁয়ে বন্ধু হরিদাস বর্মণ এবং পেছনে শীলব্রত চৌধুরী ও অন্যান্য। মানিকগঞ্জের পথে কচি-কাঁচার মেলা-১৯৬৫

বাড়িতে। সাম্প্রতিক সাহিত্য, শিল্পকলা, সংগীত, পত্রপত্রিকা ও দেশের রাজনীতি এবং পাক-সরকার বিরোধী আন্দোলন- এমনি হাজার বিষয়ে আমাদের আলোচনা। আর এই আড্ডা থেকেই নানারকম কাজের, নতুন নতুন কাজের পরিকল্পনা। এ সময়েই কোলকাতা থেকে এলো শিশু সাহিত্যিক এখলাস উদ্দিন আহমদ। ধীরে ধীরে সেও আমাদের গোপীবাগের আড্ডার সদস্য হয়ে গেল। তার 'এক যে ছিল নেংটি' (সাড়া জাগানো শিশুদের বই) শাহাদত ও আমার উৎসাহে দাদাভাই ইত্তেফাকের কচি-কাঁচার আসরে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করলেন। এখলাসউদ্দিন আহমদ 'ছড়ায় ছড়ায় ছন্দ' নামে দুই বাংলার ছড়া নিয়ে যে অসাধারণ ছড়া সংকলন করেছেন- তার পূর্ব বাংলা অংশের লেখকদের ছড়া সংগ্রহ ও সম্পাদনায় পরিপূর্ণ সহযোগিতা করেছেন শাহাদত চৌধুরী। ইতিমধ্যে কচি-কাঁচার মেলা থেকে রোকনুজ্জামান খান দাদাভাইয়ের সম্পাদনায় বাংলাভাষার শিশু কিশোরদের জন্য সুপাঠ্য ও আকর্ষণীয় মাসিক পত্রিকা বের হয়েছে- নাম 'কচি ও কাঁচা'। অল্প দিনেই এই পত্রিকা সাহিত্য জগতে বিপুল সাড়া জাগালো। দুই বাংলাতেই এই পত্রিকার সুনাম ছড়িয়ে পড়লো। এই পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে ছিলাম দাদাভাইয়ের বিশ্বস্ত ও আস্থাভাজন চার বন্ধু- শাহাদত চৌধুরী, মাহবুব তালুকদার, শামসুজ্জামান খান ও আমি।

কচি ও কাঁচা মাসিক পত্রিকা বের হবার

কয়েক বছর পর আরেকটি কিশোর পত্রিকা টাপুর টুপুর প্রকাশের প্রাথমিক পর্যায়ে একটি শিশু সংকলন প্রকাশিত হয়। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের (বর্তমান বাংলাদেশ) সেরা লেখকদের চমৎকার সব লেখায় সুন্দর ছবি ও পরিচ্ছন্ন মুদ্রণে টাপুর টুপুর শিশু কিশোর সংকলনটি হয়ে উঠেছিল সমৃদ্ধ। প্রধান সম্পাদক ছিলেন প্রকাশক সৈয়দ মোহাম্মদ শফি। আর সম্পাদকমন্ডলীতে ছিলেন এখলাস উদ্দিন আহমেদ, শাহাদত চৌধুরী, বুলবন ওসমান ও হাশেম খান। বস্তুত এই সম্পাদকমন্ডলীর মধ্যে শাহাদত চৌধুরীই সবচেয়ে বেশি দায়িত্ব নিয়ে তার সৃজনশীল শ্রম ও পরামর্শ দিয়ে 'টাপুর টুপুর'কে অনবদ্য করে তুলেছিলেন। আমার গোপীবাগের বাড়িতে আমাদের আড্ডায় বসে এই সংকলনের সম্পাদনার কাজ সমাধা হয়েছিল।

'ললনা' সাপ্তাহিক পত্রিকার পরিকল্পনা ও সম্পাদনার মূল দায়িত্বে ছিলাম আমরা তিনজন- মুহম্মদ আখতার (১৯৭১-এ রাজাকার কর্তৃক ১৪ ডিসেম্বরে শহীদ), সৈয়দ শাহজাহান ও আমি। সঙ্গে নিয়েছিলাম বন্ধু মোফাবেজা খানমকে। অল্প কয়েক দিনেই 'ললনা' পাঠক মহলে সাড়া জাগালো। একদিন নিয়ে এলাম বন্ধু শাহাদতকে। প্রশ্ন-উত্তরের একটি বিভাগের দায়িত্ব দেয়া হলো। অল্প কয়েক দিনেই বিভাগটি জনপ্রিয় হয়ে উঠলো শাহাদত চৌধুরীর বুদ্ধিদীপ্ত মন্তব্য, সরস ও তীক্ষ্ণ আলাপচারিতায়। ধীরে ধীরে শাহাদতের সৃজনশীল পরামর্শে ললনার চেহারা আরো উজ্জ্বল হতে লাগলো। শিল্পী রফিকুন নবীকেও নিয়ে এলাম 'ললনা' গ্রুপে। এরপর আসলো আহমেদ নূরে আলম, বেবী মওদুদ, শাহরিয়ার কবির এবং আরো অনেকে। শাহাদত চৌধুরী 'ললনা' পত্রিকার জন্য অপরিহার্য হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে পারলো।

আগেই উল্লেখ করেছি গোপীবাগ তৃতীয় গলির ২৫ নং বাড়ির আড্ডায় বসে নতুন কিছু সৃজনশীল কিছু করার বিষয় আমাদের মাথায় ঘুরপাক খেতো। একদিন ঠিক করলাম শিশুদের জন্য টেলিভিশনে নাটক করবো। আমি ও শাহাদত মিলে সব পরিকল্পনা ঠিকঠাক। শীলব্রত চৌধুরীকে দিয়ে লিখিয়ে নিলাম একটি রূপক নাটক। এমন সময় এখলাসউদ্দিন আহমেদ এসে বললেন- এতো কষ্ট করছেন কেন? আমার 'এক যে ছিল নেংটি' তো তৈরিই আছে। এটা অনেকেই পড়েছে। শিশুদের কাছেও প্রিয়।

আমরা 'এক যে ছিল নেংটি' প্রথম করলাম, পরে করলাম শীলব্রতের রূপক নাটিকাটি (আজ এতোদিন পর নাম ভুলে গেছি)। নাটক দুটি সুন্দর ও সুচারুভাবে তৈরি করার জন্য শাহাদতের উৎসাহ ও কর্ম পরিকল্পনা ছিল অসাধারণ। এক যে ছিল নেংটির নাট্যরূপ সম্ভবত শাহাদতই দিয়েছিল। নাটকের রিহার্সাল দেখা এবং সুন্দর পরামর্শ দেয়ার জন্য শিল্পী মুস্তফা মনোয়ার প্রতিদিনই কিছুক্ষণের জন্য চলে আসতেন গোপীবাগের আড্ডায়। নাটক দুটির মূল নির্দেশনা শাহাদতেরই ছিলো। এমনকি নাটকের সঙ্গীত ও শব্দ প্রেক্ষণে মুস্তফা মনোয়ারকে সফল সহযোগিতা করেছিলো শাহাদতই। নাটকে চমৎকার অভিনয় করেছিল- শিমুল বিল্লাহ, মিনু বিল্লাহ, বুলবুল মহলানবীশ, সুলতানা কামাল, সাঈদা কামাল, লিনু বিল্লাহসহ আরো কিছু শিশু-কিশোর।

এখন যে নবান্ন উৎসব হচ্ছে- প্রতি বছর চারুকলা ইনস্টিটিউট প্রাঙ্গণে এই 'নবান্নোর' ঐতিহাসিক পরিকল্পনাও প্রথম আলাপ আলোচনা হয়েছিল গোপীবাগের আড্ডায়। মনে পড়লো- শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনও এমন একটি উৎসব করা যায় কিনা আমাদের কিছুদিন আগে বলেছিলেন। শাহাদত চৌধুরী, বুলবন ওসমান, রফিকুন নবী ও আমি চলে এলাম শিল্পাচার্যের শান্তি নগরের বাড়িতে। ষাটের দশকে আমাদের তারুণ্যের অনেক কাজের মধ্যে একটি প্রধান কাজ ছিল- যখনই মাথায় কিছু আসতো চলে আসতাম জয়নুল স্যারের কাছে। আমাদের কথা বলতাম বা কোনো কোনো দিন তন্ময় হয়ে শুনতাম স্যারের জীবন-সংগ্রামের কথা- দুর্ভিক্ষের ছবি আঁকার কথা, দেশ-বিদেশের ছবির কথা, দেশের কথা বাংলার সংস্কৃতি, লোকশিল্প, লোকগান, লোকাচার তথা কৃষি ভিত্তিক বাংলার সমৃদ্ধ সমাজ সংস্কৃতির কথা- তাঁর উপলব্ধি ও স্বপ্নের কথা।

নবান্ন উৎসব জয়নুল আবেদিনের নেতৃত্বে আমরাই যাত্রা শুরু করি একটি উজ্জ্বল চিত্র প্রদর্শনী ও ছোট্ট একটি কবিতা সংকলন প্রকাশের মাধ্যমে। প্রদর্শনীর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিল শিল্পাচার্যের আঁকা ৬০ ফুট দীর্ঘ ৫ ফুট প্রস্থ এক দীর্ঘ স্ক্রল চিত্র। বিষয়- আবহমান বাংলা- কৃষক জীবন, গ্রাম-গ্রামবাংলার মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষা সুখ-দুঃখের আলেখ্য। এই স্ক্রলচিত্রটি জয়নুল আবেদিনের উল্লেখযোগ্য শিল্পকর্ম হিসেবে বাংলাদেশের মূল্যবান সম্পদ। এই ঐতিহাসিক স্ক্রল চিত্রটি জয়নুল আবেদিনকে দিয়ে আঁকিয়ে নেয়ার পেছনে শাহাদত চৌধুরীসহ আমাদের কয়েক জনের চেষ্টা ও কৃতিত্ব আজ স্মর্তব্য। নবান্ন আয়োজনে আমরা যারা সেদিন একত্রিত হয়েছিলাম তাঁরা হলেন- শাহাদত চৌধুরী, বুলবন ওসমান, রফিকুন নবী, মুহম্মদ আখতার (ললনার কর্মাধ্যক্ষ), মনজুরুল হাই, বীরেন সোম, আবুল বারক আলভী, মতলুব আলী প্রমুখ। এখানে উল্লেখযোগ্য, ১৯৬৮ সালে জয়নুল আবেদিনকে তাঁর সারা জীবনের শিল্পকর্মের অবদানের জন্য শ্রদ্ধা ও সম্মানসূচক 'শিল্পাচার্য' উপাধি প্রদানের এবং চারুকলা ইনস্টিটিউটে বার্ষিক চিত্রপ্রদর্শনীতে অনুষ্ঠান করে এই ঐতিহাসিক ঘোষণা দেয়ার মূল পরিকল্পনা ও তা বাস্তবায়নে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছিল শাহাদত চৌধুরী ও তার কয়েকজন শিল্পীবন্ধু। এরা হলেন- মনজুরুল হাই, মতলুব আলী ও রেজাউল করিম।

ষাটের দশকে শাহাদত চৌধুরী, রফিকুন নবী, বুলবন ওসমান ও আমার আরো একটি বাড়িতে অবাধ যাতায়াত ছিল। যখনই সুযোগ পেয়েছি- তাঁর স্নেহ পেতে, আশীর্বাদ পেতে, আমাদের কাজে উৎসাহ পেতে, প্রেরণা পেতে চলে আসতাম আমাদের সবার খালাম্মা- সুফিয়া কামালের কাছে। এখানেও আমাদের আড্ডা জমে উঠতো- খালার মেয়ে সুলতানা কামাল, সাঈদা কামাল ও ছেলে শাহেদ কামালের সঙ্গে। খালু জনাব কামাল উদ্দিন খান ছিলেন অসাম্প্রদায়িক উদার ও সিংহহৃদয় মানুষ। আমাদের সঙ্গেও তিনি গল্পে যোগ দিতেন।

ষাটের দশক শাহাদত চৌধুরী ও তার বন্ধু আমাদের কয়েকজনের জন্য ছিল অর্জনের দশক, নিজকে শক্তভিতের ওপর দাঁড় করাবার দশক। ভবিষ্যতের স্বপ্নগুলোকে বাস্তবে রূপ দেয়ার অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের মূল্যবান সময়। তাই দেখি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১৯৭১-এ ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণের পর অসহযোগ আন্দোলনের সময় মার্চের ১২ তারিখ চিত্রশিল্পীরা যে দুঃসাহসিক পোস্টার ও চিত্র-মিছিল বের করেছিল- একটি মাত্র লক্ষ্য বাঙালির স্বাধীনতা। এই চারটি আদ্যক্ষর চারটি মেয়ের গলায় ঝুলিয়ে রাজপথে শিল্পাচার্য জয়নুলের নেতৃত্বে শহীদ মিনার থেকে বাহাদুর শাহ পার্ক পর্যন্ত মিছিল করে গিয়েছিলাম। এমন একটি দুঃসাহসিক চিত্রকলা মিছিলের বাস্তবায়নেও সেদিন শাহাদত চৌধুরীর মেধা, যুক্তিপূর্ণ পরামর্শ, শিল্পীদের কর্মকান্ডকে সার্থক করে তুলতে সহায়ক ভূমিকা রেখেছিল।

আর এই ধারাবাহিকতায় ২৬ শে মার্চের পর শাহাদত চৌধুরী যখন মুক্তিযুদ্ধে চলে যায়- আমি অবাক হইনি। সেটাই ছিল স্বাভাবিক। তাঁর পুরো পরিবাই ছিল অসাম্প্রদায়িক, বাঙালির স্বাধীনতায় বিশ্বাসী এবং যোদ্ধা। তাই ফতেহ আলী আজ গর্বভরে বলতে পারে- সেজ ভাই শাহাদত চৌধুরী ও ছোট ভাই মোর্শেদ আলীর সঙ্গে তার দেখা হয়েছিল রণাঙ্গনে সশস্ত্র যুদ্ধক্ষেত্রে।

স্বাধীন বাংলাদেশে আমরা যে সৃষ্টিশীল, স্বাপ্নিক এক নতুন যোদ্ধা শাহাদত চৌধুরীকে পেয়েছি- যিনি 'পদ্মানদীর মাঝি' গ্রন্থের হোসেন আলীর মত- শত ঝঞ্ঝা, শত সমস্যাকে তুচ্ছজ্ঞান করে নতুন এক জনপদের মত- নতুন সৃষ্টি 'বিচিত্রা' প্রতিষ্ঠা করেছেন তার শক্ত ভিত, সাহস ও শক্তি অর্জন হয়েছিল তার তারুণ্যে ষাটের দশকে।

(লেখাটি তাড়াহুড়ো করে লেখা- পুরনো স্মৃতি- অনেকের নাম বাদ পড়তে পারে। ক্ষমাসুন্দর চোখে দেখবেন। জানালে ঠিক করে নেব।

শাহাদত চৌধুরী: আমার স্মৃতিতে

নির্মলেন্দু গুণ

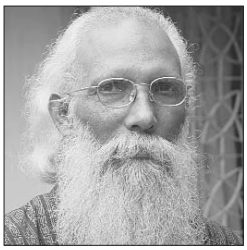

হেমন্তের পাকা হলুদ ধানের মতো ক্রমাগত ঝরে পড়ছে আমার প্রিয় বন্ধুরা। আমার সেই সব ঝরে-পড়া বন্ধু-তালিকার আপাত শেষ সংযোজন শাহাদত চৌধুরী। বেশ কিছুকাল আরোগ্যাতীত মস্তিষ্কের ব্যাধিতে ভোগার পর, গত ২৮ নবেম্বর তাঁর জীবনাবসান ঘটেছে। আমি তাঁর রুহের মাগফিরাত কামনা করছি।

তাঁর জীবনের শেষ অধ্যায়টি যদিও অতিবাহিত হয়েছে সাপ্তাহিক ২০০০ পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক হিসেবে, তবু বাংলাদেশের চল্লিশোর্ধ্ব পত্রিকা-পাঠকদের কাছে কিন্তু আজও সে 'বিচিত্রা সম্পাদক' হিসেবেই অধিক খ্যাতিমান। নতুন প্রজন্মের কথা ঠিক বলতে পারবো না, তারা হয়তো বিচিত্রা সম্পাদক বলতে আমার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের সহপাঠিনী বন্ধু বেবী মওদুদকেই জানেন। কেননা, প্রেস ট্রাস্ট বিলুপ্ত হওয়ার পর গত ৭-৮ বছর ধরে বিচিত্রা তাঁরই সম্পাদনায় প্রায় একই চেহারা ও আঙ্গিকে প্রকাশিত হয়ে বাজারে আসছে। আজকে আমাদের দেশে সাপ্তাহিক পত্রিকাগুলোর যে চেহারা দেখতে পাই, সেই চেহারাটা কিন্তু শাহাদতই তৈরি করে দিয়ে গেছেন। বিচিত্রা কাগজটিকে আমরা তিন অধ্যায়ে ভাগ করতে পারি। প্রথম অধ্যায়টি হচ্ছে স্বাধীনতাপূর্ববর্তী কাল। সম্ভবত ৬৮-৬৯ সাল হবে। পাক্ষিক বিনোদন পত্রিকা হিসেবে প্রেস ট্রাস্ট থেকে দৈনিক পাকিস্তানের পাশাপাশি বিচিত্রা প্রকাশিত হতে শুরু করেছিলো। সম্পাদক ছিলেন কবি ফজল শাহাবুদ্দীন। আমার মনে আছে কেন? আমি তখন কোনো একটা কাজ বাগানোর লোভে তাঁর চারপাশে ঘুরঘুর করতাম। সাজ্জাদ কাদির সেখানে প্রতিবেদকের কাজ পেয়েছিলো। ফজল ভাইয়ের নির্দেশে আমাকে সঙ্গে নিয়ে সাজ্জাদ গিয়েছিলো তৎকালীন জনপ্রিয় নায়ক রহমানের সাক্ষাৎকার নিতে। তখন রমজান মাস। সদ্য গজানো ঘন কালো তরুণ দাড়িতে আমাকে ক্ষিপ্ত তরুণ মৌলানা বলে ভ্রম হয়। নায়ক রহমানের ধানমন্ডির বাসায় আমার কারণে সেদিন সাজ্জাদেরও খুব ভালো ইফতার হয়েছিলো। পরে ফজল ভাইকে ফোন করে রহমান বলেছিলেন, আপনি ভাই আমার কাছে এক মৌলানা পাঠাবেন ভাবতে পারিনি। সে জন্যই বিচিত্রার শুরুটা আমার বেশ মনে আছে।

শাহাদতের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় কীভাবে কোথায় হয়েছিলো মনে নেই। সম্ভবত শরীফের ক্যান্টিনেই হবে। নবজাগরণের চেতনায় উদ্বুদ্ধ ষাট দশকের কবি-সাহিত্যিক-শিল্পী-রাজনীতিক-নাট্যকার-সাংবাদিকদের একটা বড় মিলনস্থল ছিলো শরীফ

আমাদের তৎকালীন জনপ্রিয় আড্ডাস্থল শরীফ মিয়ার ক্যান্টিনে পাওয়া বন্ধু (যতদূর মনে পড়ে) আর্ট কলেজের লিচুতলা থেকে ডিগ্রি পাওয়া শাহাদত, বিচিত্রার সঙ্গে যুক্ত হয় বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের পরে, ১৯৭২ থেকে। সম্ভবত অন্যতম সহকারী সম্পাদক হিসেবে। তখন সে শুধু পাস করা শিল্পী হিসেবে নয়, একজন দুঃসাহসী মুক্তিযোদ্ধা হিসেবেও বিশেষভাবে খ্যাত। মুক্তিযুদ্ধের ভেতর দিয়ে অর্জিত তাঁর অভিজ্ঞতা ও জন্মসূত্রে পাওয়া লিডারশিপ কোয়ালিটিকে কাজে লাগিয়ে শাহাদত দ্রুতই বিচিত্রার সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী হয়ে ওঠে। বিনোদনপ্রধান বিচিত্রা পত্রিকাটিকে সে একটি সিরিয়াস সাপ্তাহিকের আদলে গড়ে তুলতে শুরু করে। সেটিই হচ্ছে বিচিত্রার দ্বিতীয় অধ্যায় বা শাহাদত চৌধুরীর সূচনা পর্ব। প্রেস ট্রাস্ট বিলুপ্ত হওয়ার পর সাপ্তাহিক ২০০০ প্রকাশের পূর্ব পর্যন্ত তা অব্যাহত ছিলো। অতঃপর শেখ রেহানার মলিকানায় বেবী মওদুদের সম্পাদনায় বিচিত্রার তৃতীয় পর্বটি চলছে গত ৭-৮ বছর ধরে।

শাহাদতের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় কীভাবে কোথায় হয়েছিলো মনে নেই। সম্ভবত শরীফের ক্যান্টিনেই হবে। নবজাগরণের চেতনায় উদ্বুদ্ধ ষাট দশকের কবি-সাহিত্যিক-শিল্পী-রাজনীতিক-নাট্যকার-সাংবাদিকদের একটা বড় মিলনস্থল ছিলো শরীফ। পরিচয়ের কিছুদিনের মধ্যেই শাহাদতের সঙ্গে আমার সম্পর্ক বেশ গভীর হয়ে উঠেছিলো। ফলে আমরা আপনি থেকে নেমে গিয়ে পরস্পরকে তুমি বলে সম্বোধন করতে শুরু করি। আমার স্পষ্ট মনে পড়ে, ওঁদের হাটখোলার বাসায় আমি একাধিকবার অন্ন গ্রহণ করেছি। সেই সূত্রে ওদের পরিবারের সঙ্গে আমার বেশ নিবিড় সম্পর্ক গড়ে ওঠে। শাহাদতের ছোট ভাই ফতেহও একই সঙ্গে আমার বন্ধু হয়ে যায়। আবুল হাসানের কথা মনে পড়ছে। সেও ছিলো।

তাঁর মৃত্যুর পরই আমি প্রথম জানলাম, শাহাদত আমার চেয়ে দু'বছরের বড় ছিলো। আগে কখনও জানিনি। আমার চেয়ে বয়সে বড়, তা এক বছর দু'বছর যাই হোক না কেন, আর কারও কথা আমার স্মরণে আসছে না, যার সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছিলো তুমির মতো অন্তরঙ্গ ও নির্ভার।

ষাট দশকের কবিরা শাহাদতের কাছে এই দিক থেকে ঋণী যে, ষাট দশকের গুরুত্বপূর্ণ কবিদের ছবি দিয়ে

একটি দীর্ঘ অনুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রকাশ করেছিলো বিচিত্রা। কবি ও কবিতা নিয়ে ওরকমের অনুসন্ধানী প্রতিবেদন আর কোথাও আজ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছে বলে আমার মনে পড়ে না। ষাট দশকের কবি ও কবিতাকে পাঠক দরবারে পৌঁছে দেয়ার ক্ষেত্রে শাহাদতের ভালো ভূমিকা ছিলো। কলকাতার শারদীয় দেশ পত্রিকার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ঢাকায় ঈদসংখ্যা প্রকাশের ধারণাটিও ছিলো শাহাদতের। তাঁর সঙ্গে আমার রাজনৈতিক চিন্তা-ভাবনার বিরোধ থাকলেও তাঁর সৃজনশীল সাংবাদিকতার ধারণাটিকে আমি সর্বদা সম্মান করেছি। সরকার নিয়ন্ত্রিত প্রেস ট্রাস্টের পত্রিকা হিসেবে বিচিত্রার যেসব সীমাবদ্ধতা ছিলো, শাহাদত সর্বদা ঐ সীমাবদ্ধতাকে পাশ কাটিয়ে পথ চলতে চেয়েছে। অনেক সময় পেরেছে, আনেক সময় পারেনি। ফলে শামসুর রাহমান সম্পাদিত এরশাদের কবিতা বিচিত্রায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হলেও, আমি দীর্ঘদিন বিচিত্রায় লিখিনি। এ নিয়ে শাহাদত কোনো অনুযোগ করেনি। বরং দেখা হলে আমাকে বলেছে, আমি তোমার নৈতিকতার প্রশংসা করি।

তাঁর সঙ্গে আমার শেষ দেখা হয়েছিলো সাপ্তাহিক ২০০০ পত্রিকার কার্যালয়ে। শারীরিকভাবে প্রায় অচল হয়ে পড়েছিলো বলে অফিসে খুব একটা আসতো না। আমি তাঁর সম্পাদিত কাগজে অনেক দিন পর লিখতে শুরু করেছি জেনে শাহাদত খুব খুশি হয়েছিলো। অস্ট্রেলিয়ার ওপর রচিত আমার ভ্রমণকথাটির নাম নিয়ে আমি যখন কিছুটা দ্বিধার মধ্যে ছিলাম, তখন শাহাদত আমাকে নাম নির্বাচনে সাহায্য করেছিলো। সানন্দে স্মরণ করেছিলো মৈত্রেয়ীর কথা। আমার সিডনি ভ্রমণের ওপর লেখা রচনার 'ভুবন ভ্রমিয়া শেষে' নামটি ছিলো শাহাদতেরই অনুমোদন সাপেক্ষে নির্বাচিত। তারপর আরেকবার তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। তখন ২০০০ পত্রিকার অফিসের কম্পিউটারে বসে আমি সুনামির ওপর একটি লেখা লিখছিলাম। ওটাই ছিলো শাহাদতের সঙ্গে আমার শেষ দেখা। সেদিন আমরা একসঙ্গে লাঞ্চ করেছিলাম।

তারপর অনেকবার ২০০০-এ গিয়েছি, কিন্তু শাহাদতের দেখা পাইনি। খবর নিয়ে জেনেছি তাঁর অসুস্থতার সংবাদ। বুঝেছি তাঁর রোগমুক্তির সম্ভাবনা খুবই কম।

২৮ নভেম্বর তাঁর সব অসুস্থতার অবসান হয়েছে। তাঁর খুব প্রিয় কবি ছিলো আবুল হাসান। হাসানের মৃত্যুদিবস ২৬ নভেম্বর। আমার বন্ধু শাহাদত চৌধুরী আমার কবি-বন্ধু আবুল হাসানের মৃত্যু দিনটিকে প্রায় ছুঁয়ে গেলেন।

কষ্ট হচ্ছে এই ভেবে যে, তাঁর নিজের পত্রিকায় প্রকাশিত হলেও আমার এই লেখাটি তাঁর প্রশংসা থেকে বঞ্চিত হবে।

ব্যতিক্রমী মানুষ

আতাউস সামাদ

কোনো সাপ্তহিক পত্রিকার সম্পাদক যখন ভালো দৈনিক পত্রিকার সম্পাদকের সম্মান ও খ্যাতি অর্জন করেন, তখন স্বীকার করতেই হবে যে তিনি আপন কাজের ক্ষেত্রে খুবই সফল ছিলেন। শাহাদত চৌধুরী তেমনই একজন সম্পাদক। তাঁর মৃত্যুতে বাংলাদেশের সাংবাদিক জগতের অপূরণীয় ক্ষতি হলো। বেঁচে থাকলে শাহাদত চৌধুরী অসুস্থতাবশত যদি এখন সরাসরি কাজ করতে নাও পারতেন তবু কাছে গিয়ে তার চিন্তাভাবনা এবং ধারণা জেনে নিয়ে সাংবাদিক ও প্রকাশকরা উপকৃত হতে পারতেন। কারণ, তার কল্পনা ও চিন্তাশক্তি কখনো অলস হয়নি। এমনিতে তিনি খুবই পরিশ্রমী ছিলেন। ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হবার পর তিনি শারীরিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন কিন্তু তাঁর মন ছিল সজীব।

শাহাদত চৌধুরী ব্যতিক্রমী মানুষ ছিলেন। তাই চারুকলা শিখেও রণাঙ্গনের মুক্তিযোদ্ধা হয়েছেন। তারপর যখন সাংবাদিক হয়েছেন তখন পত্রিকার অলঙ্করণের কাজে না গিয়ে সম্পাদনার দায়িত্ব নিয়েছেন। সাময়িকী হোক অথবা দৈনিক পত্রিকা, রেডিও হোক অথবা টেলিভিশন, সম্পাদককে ভালো সংগঠকের কর্তব্য পালন করতে হয়। তদুপরি সাপ্তাহিক পত্রিকাকে দৈনিকের পর বাড়তি কিছু দিতে হয় বলে এ কাজটি আরো কঠিন। শাহাদত চৌধুরী এই কঠিন দায়িত্ব পালন করেছেন সুনিপুণ ও সফলভাবে। একদিকে তিনি সাপ্তাহিক বিচিত্রার পাতায় নতুন নতুন বিষয়ের সন্নিবেশ ঘটিয়েছেন, অন্যদিকে তিনি তাঁর প্রজন্মের একদল তরুণ সাংবাদিককে জড়ো করে তাদের অনুপ্রাণিত করেছেন সাহসী তদন্তমূলক প্রতিবেদন তৈরি করতে অথবা চমক সৃষ্টি করার মতো ফিচার লিখতে। এরা এমন সব প্রতিবেদন লিখেছিলেন যা দৈনিক পত্রিকার রিপোর্টারদের কাজকে রীতিমতো চ্যালেঞ্জ করতো। এই সাংবাদিকদের মধ্যে মনে পড়ছে শাহরিয়ার কবির, মাহফুজউল্লাহ, মাহমুদ শফিক, আনু মুহাম্মদ, চিন্ময় মুৎসুদ্দি, ফারুক ফয়সল, চন্দন সরকার, শিহাব আহমদ ও আহমেদ নূরে আলমের নাম। বিচিত্রার পাতায় প্রতি সপ্তাহে রনবীর কার্টুনে টোকাই আবির্ভূত হতে হতে তার নামটি এখন অভিধানে উঠে এসেছে 'বঞ্চিত শিশু'র সমার্থক হয়ে। খ্যাতিমান, জনপ্রিয় এবং সফল ঔপন্যাসিক হুমায়ূন আহমেদও সাহিত্য অঙ্গনে পা দেন বিচিত্রার হাত ধরে। এখানে এও স্মরণ করি যে শাহাদত চৌধুরী বাংলাদেশের সেরা কয়েকজন সাহিত্যিক ও সাংবাদিকের সমর্থন পেয়েছিলেন। এঁরা হলেন, কবি হাসান হাফিজুর রহমান, কবি শামসুর রাহমান, সাংবাদিক নূরুল ইসলাম পাটোয়ারী এবং সাংবাদিক আহমেদ হুমায়ূন। এরা প্রত্যেকেই দৈনিক বাংলা পত্রিকাটির সম্পাদকের পদ অলঙ্কৃত করেছেন। আর বিচিত্রা ছিল দৈনিক বাংলার অঙ্গ সংগঠন। এঁদের সমর্থন ও সহযোগিতা শাহাদত চৌধুরীর সাফল্যের জন্য বিশেষ সহায়ক ছিল।

পত্রিকার বাইরেও শাহাদত চৌধুরী অনায়াসে বিচরণ করতেন সাংস্কৃতিক ও আধা-রাজনৈতিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে। আর দারুণ মজলিশি মানুষ ছিলেন বলে দেশে-বিদেশে তাঁর বন্ধু ছিল অগণিত। শাহাদত চৌধুরীর অনেক গুণের মধ্যে একটি ছিল তার আধুনিকতা। সাপ্তাহিক ২০০০ পত্রিকাটিকে তিনি গড়তে সচেষ্ট ছিলেন আধুনিক নাগরিক সমাজের জন্য উপযোগী করে। আশা করি ২০০০ পত্রিকাটি সেই পথে চলে সফল হবে। আল্লাহ শাহাদত চৌধুরীর বিদেহী আত্মাকে শান্তি দিন। তাঁর পরিবারের সদস্যদের প্রতি রইল আমাদের গভীর সমবেদনা।

কাল অকালের শাহাদত চৌধুরী

সেলিম আল দীন

একটা মানুষের বেঁচে থাকাটা মৃত্যুই জানিয়ে দেয় চূড়ান্তরূপে। জানিয়ে দেয় যে সে বেঁচে ছিল ভূলোকের আলো-অন্ধকারে, শস্যে ও খরায়। বাঁচার নিশ্চিদ্র দিনগুলো অন্যদের চোখে কতই না স্বাভাবিক। এই তো আছে- চলছে, সবার সঙ্গে পাঁচ ইন্দ্রিয়ের সবকটি জানালা-দরজার মতো- তাতে কোনো একটা মানুষের জন্য আলাদা করে শোকের ঘর বানিয়ে মোমবাতি জ্বালানের দরকার হয় না।

কিন্তু মৃত্যু আপতিত হলে- চিরলুপ্তির প্রথম রেখার চৌকাঠে দাঁড়িয়ে আমরা ওই দিকের ঘন অন্ধকারের দিকে চোখ রেখে শিউরে উঠি- ওই যে চলে গেলো সাদা কাফনাবৃত, সে আর ফিরবে না কোনো দিন। তখন সহসা বুঝতে পারি, মানুষটা এতোদিন প্রাত্যহিকের সঙ্গে ছিল, এখন একেবারে ভিন্ন সে। নিস্পন্দ-নিথর শরীর তার চা পাতা আর বরফের চাঙড়ের নিচে।

তবে শোক বিস্তারিত আকাশ ও ভুবনের সর্বত্র ছায়া ফেলে না। যে মরে, শুধু তার বৃত্ত ঘিরেই ওঠে শোকের মাতম। ভক্ত হৃদয় অন্ধ আবেগে দেখতে পায়-বৃক্ষরা নিথর-পাখির কণ্ঠেও শোক। সে দেখতে পাওয়া শোকচিত্র মিথ্যে নয় কিন্তু তা সম্পূর্ণ সত্যও নয়। কিন্তু সত্যের বিস্তারিত রূপ ব্যতিরেকেও সত্য মানুষের ব্যক্তিগত আবেগের স্থল থেকে সত্য রূপে ভাষ্য হয়ে ওঠে।

শাহাদত চৌধুরীর অকাল মৃত্যুকে ঘিরে এসব ভাবনা এলে দেখতে পাই একদিন তিনি বেঁচে ছিলেন বলে খুবই স্বাভাবিকভাবে দরকার হলে মনে পড়তো- তারপর ভুলে যেতাম। যখনই মনে উঠতো ধ্বনি কিংবা চিত্রে- এক বিপুল স্বস্তিবোধ করতাম যে তিনি আছেন এবং তাঁর না থাকাটা একেবারেই হিসেবের মধ্যে পর্যন্ত রাখিনি। শাচৌ এই শব্দবন্ধ কিংবা তাঁর দীপিত মুখ মনে এলে ভেবেছি- আমার কাজের জন্য ভাবনার জন্য একজন নিরবচ্ছিন্ন পথিক সঙ্গী তো রয়েছেন। তার আন্তরিক কণ্ঠ বচনকালে ঘন ঘন জ্বলে ওঠা চশমার ফাঁক দিয়ে আমার মুখের ওপর দৃষ্টি ফেলা ভরাট মুখে ভাস্করের খোদাই শোভন সৌন্দর্য একেবারে অভিভূত করে তুলতো আমাকে।

মাঝেমধ্যে তির্যক বাকভঙ্গি আর হাসি- সব মিলে তাঁর সঙ্গ হয়ে উঠতো দূর তীর্থগামীর নিশি যাপনের ঘর।

কোনো সংস্কার, আচার তাঁকে কখনো জীবনের সুবৃহৎ আহ্বান থেকে নিরুদ্ধ করতে পারেনি। তাঁর চোয়ালের দৃঢ়তায় আমরা বাংলাদেশের মানচিত্র দেখতাম। দেখতাম বিকীর্ণ সূর্যের রঙ। মুক্তিযুদ্ধের গভীর বিশ্বাসে গড়ে ওঠা তাঁর যৌবনকে এক সমুদ্র জোয়ারে প্লাবিত করেছিল মৃত্যুর কিনার পর্যন্ত। এই বিশ্বাস তাঁর ছিল যে, এ জাতি অন্যায়ের কাছে মাথানত করেনি- করবে না কোনো দিন। এ দেশের ঔপনিবেশিক অপচ্ছায়া সরিয়ে পলি-সংস্কৃতির উত্থান ঘটাতে হবে মুক্তিযুদ্ধ ও সমকালীন বিশ্বের অনুপ্রেরণায়- এমনি ভাবনা ছিল তাঁর।

আমাদের যৌবনের একেবারে শুরুতে নাসিরুদ্দীন ইউসুফ আর আমি মিলে নাট্যভাবনার যে নতুন ধারা তৈরি করতে চেয়েছিলাম ১৯৭২-৭৩ সালে তার প্রধান সড়কে সবার অলক্ষ্যে দাঁড়িয়েছিলেন তিনি। খুব মনে পড়ে ইউসুফ নির্দেশিত জন্ডিস ও বিবিধ বেলুন সংবাদ কার্টুন যখন মঞ্চস্থ হলো- চারদিকে বেশ সাড়া। কিন্তু সে সাড়া জনরব মাত্র। জনরবও ইতিহাসের অংশ হতে পারে যদি তার প্রামাণ্য থাকে

আমাদের যৌবনের একেবারে শুরুতে নাসিরুদ্দীন ইউসুফ আর আমি মিলে নাট্যভাবনার যে নতুন ধারা তৈরি করতে চেয়েছিলাম ১৯৭২-৭৩ সালে তার প্রধান সড়কে সবার অলক্ষ্যে দাঁড়িয়েছিলেন তিনি। খুব মনে পড়ে ইউসুফ নির্দেশিত জন্ডিস ও বিবিধ বেলুন সংবাদ কার্টুন যখন মঞ্চস্থ হলো- চারদিকে বেশ সাড়া। কিন্তু সে সাড়া জনরব মাত্র। জনরবও ইতিহাসের অংশ হতে পারে যদি তার প্রামাণ্য থাকে।

হঠাৎ একদিন যেনবা বসন্তের ভোরে ঘুম থেকে লাফিয়ে উঠে। শাহাদত চৌধুরীর 'বিচিত্রা'য় সংবাদ কার্টুন কাভার স্টোরি হয়েছে এবং বিচিত্রা তখন সমগ্র বাংলাদেশে উন্মুখ পাঠকের হাতে হাতে ফেরে। ঢাকা থিয়েটার প্রায় রাতারাতি পরিচিত হয়ে উঠলো সারা দেশে। আমরা আমাদের সম্মুখযাত্রায় পেলাম সুবর্ণ প্রচ্ছদের করতালি এবং সেই আনন্দ-উৎসাহ ঢাকা থিয়েটারকে করে তুললো দায়িত্বশীল। তার পরের পর্বে এলো মুনতাসর-ফণীমনসা এবং নিয়মিত অভিনয়ের ধারায় এ দেশের প্রথম পথনাটক চরকাঁকড়া প্রভৃতি নাটক।

শাহাদত চৌধুরী সেই বিরল বাঙালিদের একজন, যিনি নিজের সৃষ্টিক্ষমতাকে উৎসর্গ করেছিলেন বিচিত্রতর ও মৌলিক শিল্প সৃজনকারীদের উদ্দেশে। তাঁরই পরিকল্পনায় বিচিত্রা একটা বিনোদন সাপ্তাহিকের সব চাহিদা

পূরণ করেও হয়ে উঠেছিল বাংলাদেশের সমকালীন সাহিত্য সংস্কৃতি, চলচ্চিত্র ও চিত্রকলায় একান্ত রূপে প্রণোদনা ভূমি। তাঁকে ঘিরে আবর্তিত হতো যুদ্ধক্ষতের অজেয় ইতিহাস। তাঁকে ঘিরে আবর্তিত হতো নতুন ধারার সৃজন শিল্পীদের। তাতে বাদ যেতো না রূপসজ্জায় নতুন পথের অন্বেষণকারীগণও।

বাঙালির ঈর্ষাকাতরতা, অন্যকে হেয় করে নিজেকে নর্দমায় নিক্ষেপ করার প্রবণতা, অযোগ্যকে ব্যক্তিস্বার্থে উচ্চৈঃস্বরে যোগ্য বলার মানসিকতাকে ঘৃণা করতেন তিনি। বরং শিল্প সৃজনের ক্ষীণমাত্র ক্ষমতা যার আছে তাকে দেশলোকের দৃষ্টিসীমায় আনা যেন ছিল তাঁর সংকল্প।

অকারণ প্রশংসায় তিনি যেমন উদ্বেলিত হতেন না, তেমনি অপ্রত্যাশিত সম্ভাবনার প্রশংসায় তিনি একেবারে বসন্ত ঋতুর বাওকুড়ানি হয়ে উঠতেন।

এখন বুঝতে পারি, মুক্তিযুদ্ধে রক্তস্রোতের সাঁতারকাটা মানুষেদের চোখে যে আশার আলো বাসা বেঁধেছিলো, শাহাদত চৌধুরী তাকে দেখেছেন সমগ্র মানচিত্রের মাঝে। জাতি হিসেবে আমাদের উত্থানের

থিয়েটার নিয়ে প্রচ্ছদ

দিকগুলোকে মহামমতায় বর্ধনশীল করে তোলাই যেন তাঁর ব্রত। আর যেসব স্থলে অপঘাত অপস্মার- যে সব স্থলে জাতির সম্ভাবনা মুছে গিয়ে বিশাল হাঁ-করা কালো গহ্বর উদ্ভাসিত, তাকে প্রাণপণে ঘৃণা করতেন। সমুদ্র সংক্ষোভে ফেটে পড়তেন তিনি সেই ব্যর্থতার বেলাভূমিতে।

ক্ষণে ক্ষণে জাতির বিবেকের কানে আসন্ন প্রলয়ের লাল ঘন্টাধ্বনি শুনিয়েছেন তিনি। তিনি চাইতেন এ দেশ তার প্রকৃত গৌরবের স্থলে উঠে দাঁড়াক।

শোকগাথা

কালো রাত্রি নামছে চারদিকে, ছোবল হেনেছে সাপ তোমার মাতৃভূমির হৃৎপিন্ডে।
মশালধারী তুমি ঘুমিয়ে পড়লে কেন।
শুনতে পাচ্ছো বাংলার জনপদে গর্ভধারিণীগণের বুক ফাটা চুল ছেঁড়া চিৎকার
ভ্রূণ হত্যা হয়ে গেছে আগামী জন্মের
মশালধারী তুমি তবু ঘুমিয়ে পড়লে কেন।

দেখ সকালগুলো শোকমেঘে কালো।
থম থম। ওড়ে না বকের সার-
লগ্ন ছাড়া হঠাৎ গ্রহণ- মেঘেরা পাথর।
এমন দুঃসময়ে তোমার তো ঘুমাবার কথা নয়।

তুমি জলের সঙ্গে জল স্থলের সঙ্গে স্থল
বৃক্ষের সঙ্গে বৃক্ষ রাত্রিতে আঁধার হয়ে-
ছুড়ে দিতে হত্যা সংঘে নিশ্চিত গ্রেনেড।
সেই হাত বরফের চাঙড়ের নিচে
লুকিয়ে রেখেছো কেন।

তুমি তো চিৎকার করে বলতে এদেশ আমার-
যুদ্ধে শহীদ কবরবিহীন
নদী স্রোতে ভেসে আসা
এই অনামা এক হাজার একশ' করোটি আমার।
তুমি তো চিৎকার করে বলেছো-
এদেশের নদীদের গা ছুঁয়ে
শত্রুর হত্যার হাতের রক্ত মুছতে দেবো না এর জলে।
সে চিৎকার বরফের চাঙড়ের নিচে কেন।

ওঠো- হাত ধরো সহযোদ্ধা সহস্র জনতার।
ওঠো কবর শয়ন থেকে কাল রাত্রির
হে কাল পুরুষ।

সেলিম আল দীন রচিত এই শোকগাথাটি ২ ডিসেম্বর '০৫ শাহাদত চৌধুরী'র কুলখানিতে পাঠ করেন আফজাল হোসেন

রাজনীতির নীতিভ্রষ্টতা শাহাদত চৌধুরীকে ব্যথিত করতো। ক্রুদ্ধও হতেন তিনি। প্রতিবাদ করেছেন অন্যের কলমের ভেতর দিয়ে।

জীবদ্দশায় এক গভীর স্বপ্নের বিচূর্ণন দেখে গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলতেন। যৌবনের শুরুতে অবধারিত মৃত্যুকে উপেক্ষা করে যোগ দিয়েছিলেন মুক্তিযুদ্ধে। উজ্জ্বল আলোভরা সেই দিনগুতে দেখেছেন মাতৃভূমি উদ্ধারের যুদ্ধে সঙ্গী বন্ধুদের কেউ কেউ শত্রুর গুলিতে ঢলে পড়েছে। তাদের চোখে জীবনের প্রথম ভোরেই নেমে এসেছিল ঊষর মৃত্যুর অন্ধকার। কোনো এক স্মৃতিচারণায় তিনি এ রকম বেদনা প্রকাশ করেছিলেন যে, সঙ্গী নিহত যোদ্ধারা আখাউড়া অঞ্চলের মাটিতে ঘুমিয়ে। রাতের অন্ধকারে তিনি ট্রেনে পাড়ি দিচ্ছেন, সঙ্গে স্ত্রী এবং কন্যারা।

হয়তো সে রাতে স্মৃতি আর কষ্টের কোনো চিত্র ট্রেনের দুপাশের ধাবমান অন্ধকারে মনে মনে এঁকেছিলেন, কে জানে!

এই যে বলেছি মনে মনে ছবি আঁকা, তার কারণ শাহাদত চৌধুরী ছিলেন মূলত চিত্রশিল্পী। কিন্তু তিনি সে অর্থে কোনো সময়ে ছবি আঁকেননি। তাঁর ঘনিষ্ঠজনের ভেতর একসময় এ নিয়ে বেশ উদ্বেগ এবং হতাশা তৈরি হয়েছিল। আমিও ভাবতাম মৌলিক সৃজনের বদলে এ কেমন ক্ষমতার অপচয়।

পরে ছবি না আঁকার বিষয়টি ব্যাখ্যা করি এইভাবে যে, বহু বিচিত্র বিষয়ে অনুসন্ধানের মধ্যেই তাঁর চিত্রাঙ্কনের প্রেরণা বাহিত

হয়েছিল। রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, সংস্কৃতির নানা ভাঁজে তাঁর সচেতন অনুসন্ধান আমাদের চিন্তা ও জিজ্ঞাসাকে জাগিয়ে তুলতো।

দুর্বৃত্তের আস্ফালন ছদ্মবেশীর ভন্ডামি তিনি সহ্য করতে পারতেন না। মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে সেটা সইতে না পারাটাই নিশ্চিত। জীবন অথবা স্বাধীনতা- এই দুই অবিকল্প সংকল্পের রেখায় চলা মানুষদের পক্ষে মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তীকালের বাংলাদেশ স্বপ্নিল নকশিপাড়ের শাড়ি এবং ক্রমেই তা জীর্ণ ও শতচ্ছিন্ন হয়ে ওঠাটা সহ্য করা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়ই তো।

এ দৃশ্য এই পরিবেশ তাঁর পথেও সহ্য করা কঠিন ছিল বৈকি।

গৌরবে নির্বিকার আত্মপ্রচারে একেবারে অনিচ্ছুক এমনই মানুষ ছিলেন শাহাদত চৌধুরী বরং যথার্থ রূপে অন্যের গৌরবগাথা রচনার ভার তিনি তুলে নিতেন স্বেচ্ছায়। অভিভাবকত্বের সঙ্গে বন্ধুত্বসুলভ আচরণ ছিল তাঁর চরিত্রের অন্যতম দিক।

এ দেশ যখন মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ থেকে একটু একটু করে সরে আসছিল এবং সেসব প্রসঙ্গ যখন আলাপে উঠে আসতো, দেখতাম তার ভেতরে এক অস্থিরতা। কোনো গোপন বেদনার ঘূর্ণি উঠতো তাঁর চোখে। হাতের দিকে তাকিয়ে ভাবতাম এই হাতে শত্রুর বিরুদ্ধে অস্ত্র কীভাবে গর্জে উঠেছিল।

শাহাদত চৌধুরীর সবচেয়ে বড় স্পর্শকাতরতা ছিল মুক্তিযুদ্ধ। মুক্তিযুদ্ধের ভেতর দিয়ে আত্ম আবিষ্কারের গৌরব তাঁর চোখেমুখে কী এক দীপ্তি রচনা করে রাখতো সারাক্ষণ।

সেই স্থানটাতে কখনোই একতিল ছাড় দেননি তিনি। যখনই দেশে যুদ্ধের আদর্শ ভোগের স্পৃহায় রূপান্তরিত হতে থাকলো, শাহাদত চৌধুরী ঘৃণায় উচ্চকিত হলেন।

রাজনৈতিক অনাচারকে আদর্শের খোলস পরিয়ে তিনি পদমর্যাদা, বিত্ত-অর্থ কোনো কিছুই যাচনা করেননি। বরং একটি সামান্য পত্রিকার ভেতর দিয়ে এক অসামান্য সম্ভাবনাকে প্রকাশ করে তিনি যেন দেখিয়ে দিলেন দানের ভেতরেই আছে অমৃত আকাশ স্পর্শের আনন্দ।

একসময় বিচিত্রা বন্ধ হলো কিন্তু শাহাদত চৌধুরীর সম্পাদনার ছাঁচটা অজস্র সাপ্তাহিক আর দৈনিকে অনুসৃত হতে থাকলো। বাংলাদেশে এখন সাপ্তাহিক যা কিছু প্রকাশিত হয় তার আঙ্গিক ও প্রাণশক্তির মূলে আছে তাঁরই শিল্পদৃষ্টি সমাজভাবনা। পরে তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হলো সাপ্তাহিক ২০০০। আমাদের সমাজিক লক্ষ্যকে মুক্তিযুদ্ধের আদর্শে চালিত করাই যেন এ পত্রিকার দায়। যে দায় নিয়ে সাপ্তাহিক ২০০০-এর যাত্রা আজও অবন্ধ ও অব্যাহত রয়েছে।

২০০০-এর বিষয় নির্বাচন থেকে বুঝতে পারা যায়, বিচিত্রায় কালের বাংলাদেশে আরোও ক্ষয় ঘটেছে। সামাজিক অন্যায়, রাজনৈতিক নির্বুদ্ধিতার জয় আরোও বেগবান হয়েছে। কিন্তু কালের ঘোড়ায় যে সমাসীন সে দুস্তর পথে চাবুক ঘোরানো থামাবে কেন।

সম্ভবত দিকে ২০০১ সালের দিকে সাপ্তাহিক ২০০০-এর গোলটেবিল বৈঠকের আয়োজন হয়েছিল। উপস্থিত ছিলেন বন্ধু নাসিরউদ্দীন ইউসুফ, আমার শিক্ষক আনিসুজ্জামান, শওকত আলী, সেলিনা হোসেন প্রমুখ। গোলটেবিলের বিষয় ছিল বোধকরি বাঙালির নববর্ষ। শাহাদত চৌধুরী ছিলেন সঞ্চালক।

নববর্ষের সহস্রবর্ষী বৃক্ষের শেকড়ের খোঁজ নিতে চাইছিলেন তিনি। একটা অসাধারণ ডিসকোর্স বাঙালির ঐতিহ্য ও সমকালের অভিজ্ঞতায় নববর্ষ।

তাঁর বিশাল ও অদৃশ্য দুই হাতে আগলে রাখতে চেয়েছিলেন এই গাঙ্গেয়-দ্বীপের ভূমিরেখা সুবহ নদীর প্রবাহ, বাঙালি ও বাংলাদেশের সংস্কৃতি মুক্তিযুদ্ধের বিশাল আকাঙ্ক্ষা।

সে আশা পূর্ণ হয়নি। রাজনীতির অনাসৃষ্টি, অর্থনীতির খরা আর সংস্কৃতির ক্রমনিমজ্জন তাঁকে জীবদ্দশায় ব্যথিত করেছে। মৃত্যুতেও সেই বেদনার শ্বাস অতৃপ্ত ছায়ার আকারে ঘিরে আবর্তিত হবে আরো বহুদিন।

বাঙালির এক আধুনিকতম উন্মোচন দেখতে পাই শাহাদত চৌধুরীর জীবনযাপন ও বিশ্বাসের মধ্যে। একবার তাঁর বাসায় আয়োজিত মুক্তি-যোদ্ধাদের একান্ত সম্মিলনীতে নাসির-উদ্দীন ইউসুফ আর শিমূল ইউসুফ মিলে গিয়েছিলাম। আমাকে দেখে তাঁর এতোটা উচ্ছ্বাস মনে হয়েছিল, হয়তোবা এ আয়োজনের প্রধান ব্যক্তি আমি। সবার মধ্যে নিজেকে নিতান্ত অনাহূত মনে হয়নি সেদিন সন্ধ্যায়; বরং মনে হয়েছে শাহাদত চৌধুরী আমাকে নিয়েই বেশি উৎসাহী।

সে অনুষ্ঠানেই সম্ভবত বিবি রাসেলের সঙ্গে আমার পরিচয়। মসলিন নিয়ে নানা জটিল ও ঐতিহাসিক প্রসঙ্গ আলোচনা হয়েছিল সেদিন।

তারপর শহীদুল্লাহ খান বাদলের বাসার এক অনুষ্ঠানে সেই নাসিরউদ্দীন ইউসুফ আর শিমূল ইউসুফসহ একেবারে কবি-লেখক-নাট্যকর্মী-চিত্রীদের একত্র সংযোগের অনুষ্ঠান। আফজাল হোসেনও ছিলেন সেখানে। লায়লা খানের অসামান ও হৃদয়গ্রাহী আতিথেয়তা আর শাহাদত চৌধুরীর উচ্ছ্বসিত হাসি একেবারে সাত আকাশের তারা ফোটানোর মতো।

আজ যদি আরেকটি আসরের আয়োজন করি কেউ- তো বন্ধুরা সবাই আসবে সশরীরে শুধু শাহাদত চৌধুরী আসবেন নাম হয়ে- নামের দীর্ঘশ্বাস হয়ে।

শাহাদত চৌধুরী মুক্তিযুদ্ধের প্রেরণায় যে সাংস্কৃতিক গড়নটি প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন, তা হলো সমাজ ও দেশ-কালের অভিজ্ঞতায় পুষ্ট সংস্কৃতি। প্রায় ৩০ বছর ধরে একটানা যে কালের সেতু তিনি নির্মাণের চেষ্টা করেছেন, বাংলাদেশের আত্মিক মুক্তি সেই দিকে।

বাংলাদেশের সমাজ, রাজনীতি ও সংস্কৃতির ইতিহাসে শাহাদত নাম এ দেশ কৃতজ্ঞতার সঙ্গে উচ্চারণ করবে সন্দেহ নেই।

HALAL ONLINE SHOP Tukina Internaional FOOD

জাপান বাংলার কৃষ্টি সংস্কৃতি
বিকাশের ধারায়

TUKINA INTERNATIONAL

হালাল ফুড বিশেষ মূল্যহ্রাস ঘোষণা করছে প্রকৃত বাংলাদেশী মাছ সর্বনিম্ন ৬৯০ ইয়েন, মাংস ৮০০ ইয়েন এছাড়া স্পাইস মিষ্টি চানাচুর মুড়িসহ সকল হালাল ফুড সামগ্রী মূল্য হ্রাস করছে।

টেলিফোন অথবা ফ্যাক্স অথবা অনলাইনে আমাদেরকে অর্ডার দিন। ২৪ ঘন্টার মধ্যে আমরা তাকিউবিনের মাধ্যমে আপনার কাঙ্ক্ষিত দ্রব্যসামগ্রী পৌঁছাব।

TUKINA INTERNATIONAL
3-36-30 Nakajujo
Yamaichi Mansion-102
Tel : 03-5993-2590
090-4624-6115, Fax - 03-3908-8588

www.tukina.com

প্রশ্রয়

মুহম্মদ জাফর ইকবাল

স্বাধীনতার পর পর বাংলাদেশে শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি সবকিছুর এক ধরনের নতুন বিকাশ শুরু হয়েছিল। কবিরা নতুন ধরনের কবিতা লিখছেন, গল্পকাররা ছোট গল্প নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করছেন, আধুনিক ফর্মে নাটক লেখা হচ্ছে, সেই নাটক মঞ্চস্থ হচ্ছে। সবকিছুর কেন্দ্রবিন্দু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। পাকিস্তানের কবল থেকে মুক্তি পাবার পর বাংলাদেশের নিজস্ব কালচারটি দানা বাঁধতে শুরু করেছে। আজকাল যেরকম অনেক ধরনের পত্র-পত্রিকা, ম্যাগাজিন; তখন সেরকম ছিল না। দৈনিক পত্রিকা অনেকগুলো থাকলেও ম্যাগাজিন ছিল একটি। সেটাই সাহিত্য পত্রিকা, সেটাই সংস্কৃতি পত্রিকা, সেটাই বিনোদন পত্রিকা আবার সেটাই ফিচার ম্যাগাজিন- এর নাম ছিল 'বিচিত্রা'। আমি জানি আজকালের মানুষ আমাদের কথা বিশ্বাস করতে চাইবে না, কিন্তু সেটাই সত্য কথা। বিচিত্রা নামের সাপ্তাহিকটি তখন আমাদের দেশের সাংবাদিকতা, শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, রাজনীতি সবকিছু একা বহন করে নিয়ে যেতো। আমরা পুরো সপ্তাহ অপেক্ষা করতাম এবং সপ্তাহ শেষে বিচিত্রাটা হাতে এলে সেটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ে তবেই শান্তি। দেশের যে বিষয়টি জানা থাকা প্রয়োজন তো বিচিত্রা থেকে জেনে যেতাম। এই বিচিত্রায় কেউ যদি তার একটা গল্প বা কবিতা ছাপাতে পারতো, সে রাতারাতি বাংলাদেশের শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির এলিট ক্লাসে চলে যেতো- এ রকম ছিল তার রমরমা অবস্থা। এই বিচিত্রার সম্পাদক ছিলেন শাহাদত চৌধুরী। আধুনিক বাংলাদেশের প্রতিবিম্ব। মুক্তিযুদ্ধ করে এসেছেন, দেশের জন্য গভীর মমতা, সাংবাদিকতা জগতে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছেন। বিচিত্রা মানেই শাহাদত চৌধুরী, শাহাদত চৌধুরী মানেই বিচিত্রা।

আমি তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্স্ট কিংবা সেকেন্ড ইয়ারের ছাত্র। জোর করে সিগারেট খাওয়া শিখেছি, উষ্কখুষ্ক চুল নিয়ে শরীফ মিয়ার কেন্টিনে চা খাই। বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে আধুনিক কবিতা কিংবা পায়োনের সাব স্ট্রাকচার নিয়ে কথা বলি। ইনটেলেকচুয়াল হবার প্রাণান্তকর চেষ্টা। সেই আমি একদিন একটা সাহসের কাজ করে ফেললাম, একটা গল্প লিখে খামে ভরে বিচিত্রার ঠিকানায় পাঠিয়ে দিলাম। গল্পটার নাম 'ছেলেমানুষি'। গল্পের বিষয়বস্তু অত্যন্ত গুরুতর। বয়স কম থাকলেই এ রকম গুরুতর বিষয় নিয়ে গল্প লেখা সম্ভব। গল্পটা পাঠিয়ে দিয়ে পরের সপ্তাহে ভয়ে ভয়ে আমি বিচিত্রাটা খুলেছি। আর কী আশ্চর্য! সেখানে আমার গল্পটা ছাপা হয়ে গেছে। গল্পের সঙ্গে মানানসই আধুনিক একটা ছবি, নিচে ছাপার অক্ষরে আমার নাম লেখা। অবিশ্বাস্য ব্যাপার- আমার নিজের নাম! সম্পাদক শাহাদত চৌধুরী বিচিত্রায় আমার গল্পটি ছাপানোর উপযুক্ত মনে করেছেন- মনে হলো, মুহূর্তের মাঝে আমার মাথা ছাদ ফুটো করে আকাশের সমান হয়ে গেছে। আমি লেখক হয়ে গেছি। ভেজাল লেখক না, সত্যিকারের লেখক- যার লেখা বিচিত্রায় ছাপা হয়েছে। শাহাদত চৌধুরীর বিচিত্রায়।

ঠোঁটের ডগায় সিগারেট ঝুলিয়ে আমি কার্জন হলে গেলাম, না তাকিয়েই বুঝতে পারলাম ক্যাম্পাসের সব ছেলেমেয়ে আড়চোখে আমাকে দেখছে। আমি তো আর সাধারণ মানুষ নই, আমার লেখা বিচিত্রায় ছাপা হয়েছে

অহঙ্কারে আমার পা মাটিতে পড়ে না। ঠোঁটের ডগায় সিগারেট ঝুলিয়ে আমি কার্জন হলে গেলাম, না তাকিয়েই বুঝতে পারলাম ক্যাম্পাসের সব ছেলেমেয়ে আড়চোখে আমাকে দেখছে। আমি তো আর সাধারণ মানুষ নই, আমার লেখা বিচিত্রায় ছাপা হয়েছে। শাহাদত চৌধুরীর বিচিত্রায়। আমি এখন লেখক হয়ে গেছি। সত্যিকারের লেখক।

আমার জীবনের প্রথম সত্যিকারের লেখাটি ছাপিয়েছিলেন শাহাদত চৌধুরী। কিছুদিন পরে যখন একটু সাহস করে বিচিত্রা অফিসে দেখা করতে গিয়েছিলাম, তখন শাহাদত চৌধুরী বলেছিলেন, 'ও! তুমি জাফর ইকবাল? মনে রেখো কিন্তু তোমাকে লেখক বানিয়েছি!'

আমি সব সময় কথাটা মনে রেখেছি। শাহাদত চৌধুরীর সঙ্গে ইদানীং যখন দেখা হয়েছে, তখনো তিনি আমাকে কৌতুকভরে এবং আমি তাকে কৃতজ্ঞতাভরে কথাটা স্মরণ করিয়ে দিয়েছি। কিছুদিন আগে গুনে গুনে দেখি আমার প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা প্রায় একশ'র কাছাকাছি। সত্যিকারের বড় লেখকরা বইয়ের সংখ্যা দিয়ে তাদের সাহিত্যকর্ম বিচার করেন না, কিন্তু আমাদের মতো পার্টটাইম আধা খিচরে লেখকদের সেই সৌভাগ্য নেই বলে সংখ্যা গুনতে হয়। আমি সেই একশ'টি বই লিখে যে আনন্দ পেয়েছি, বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে সেই প্রথম গল্পটি বিচিত্রায় ছাপা হবার আনন্দ ছিল এর থেকে একশ' গুণ বেশি।

আমি কখনো কল্পনা করিনি লেখক হবো। আমি লিখতে পারি- এই আত্মবিশ্বাস আমার ভেতরে প্রথমবার জন্ম দিয়েছিলেন শাহাদত চৌধুরী। আমার মতো একজন অপরিচিত কমবয়সী ছেলেমানুষের লেখা ছাপতে তার কোনো সংকোচ হয়নি। শাহাদত চৌধুরী চলে গেছেন, তার মুক্তিযুদ্ধে অর্জিত বাংলাদেশটি আছে, সেই বাংলাদেশের অসংখ্য ছেলেমানুষ, অপরিচিত অনভিজ্ঞ লেখকরাও আছে, কে তাদের সাহস দেবে? কে প্রশ্রয় দেবে?

নতুন শাহাদত চৌধুরীরা কি তার শূন্যস্থান পূরণ করতে পারবেন?

অকালে তার চলে যাওয়া

তোয়াব খান

শাহাদত চৌধুরীর সঙ্গে আমার সম্পর্কের সূচনাকাল দৈনিক বাংলায় কাজের সময়। তিনি তখন সাপ্তাহিক বিচিত্রায় কাজ করতেন। সেখান থেকে সম্পর্ক হয়। ব্যক্তিগতভাবে তাকে জানতাম স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় ঢাকা অপারেশনের কারণে। ঢাকায় যে গেরিলা অপারেশনগুলো চালানো হয়, তার অগ্রভাগে শাহাদত চৌধুরী ছিলেন। তাছাড়া এ কাজে তিনি নানা সহযোগিতা করেছিলেন। পেশাগতভাবে শাহাদত চৌধুরী বাংলাদেশে সাপ্তাহিক যে সাময়িকী তাতে নতুন ধারা এনেছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের পরে বিচিত্রা প্রকাশিত হলে তিনি এর দায়িত্ব নেন। যদিও প্রথম সম্পাদক ছিলেন ফজল সাহাবুদ্দিন, পরে তা শাহাদতের হাতে ন্যস্ত হয়। তার হাতেই বিচিত্রা একটি আধুনিক পত্রিকা হিসেবে প্রকাশ পেতে থকে। এবং বাংলাদেশে ম্যাগাজিন হিসেবে বিচিত্রা নতুন দিক উন্মোচন করে। বিচিত্রার যে আধুনিক রূপায়ণ এবং প্রচার সংখ্যার শীর্ষে যাওয়া, তার মূল নেতৃত্বে ছিলেন শাহাদত চৌধুরী।

শাহাদত চৌধুরীর আরো কিছু গুণ ছিল যেমন- সে সময়গুলোতে অনেকেরই নীতির ক্ষেত্রে বিচ্যুতি ঘটলেও তিনি ছিলেন আবিচল। মুক্তিযুদ্ধের মূল যে চেতনা তা থেকে একটুও পিছপা হননি। এটা যেমন ব্যক্তিগত জীবনের ক্ষেত্রে, তেমনি সাংবাদিকতায়ও।

ব্যক্তিগত জীবনে শাহাদত চৌধুরীর সঙ্গে আমার সৌহার্দামূলক সম্পর্ক ছিল। ১৯৯১ সালে আমি যখন সম্পাদক হিসেবে দৈনিক বাংলায় যোগদান করি, সে সময়ের পেশাগত জীবনের অনেক স্মৃতিই তার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে। দৈনিক বাংলায় সে সময় নানা সমস্যা ছিল, শাহাদত চৌধুরী তা সমাধানে সব সময় সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন।

শাহাদত চৌধুরীর নেতৃত্বে যে সাংবাদিক দলটি বিচিত্রায় কাজ করতো তারা ছিল গতিশীল। তাছাড়া আমাদের দেশে সে সময় যে ম্যাগাজিন বের হতো তার ধারা পরিবর্তন করে বিচিত্রা সমকালীন ঘটনাবলীর ওপর জোর দিয়েছিল। সমকালীন ঘটনার প্রেক্ষাপটে জাতীয় জীবনের বিভিন্ন সমস্যার ইনডেপথ আলোচনা করা হতো। বিচিত্রা এ সময়গুলোতেও অনুসন্ধানী প্রতিবেদন তৈরি করে বেশ অবদান রেখেছিল। পরবর্তীতে বিচিত্রা বন্ধ হলে তার নেতৃত্বে সাপ্তাহিক ২০০০ প্রকাশিত হয়। এটিও এসব ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি গঠনেও অগ্রণী ভূমিকা ছিল। একাত্তরের দালালেরা কে কোথায় তার তালিকা বিচিত্রায় ছাপিয়ে শাহাদত চৌধুরী মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষ চেতনার বিরুদ্ধে ভূমিকা নিয়েছিল।

বিচিত্রা এ সময়গুলোতেও অনুসন্ধানী প্রতিবেদন তৈরি করে বেশ অবদান রেখেছিল। পরবর্তীতে বিচিত্রা বন্ধ হলে তার নেতৃত্বে সাপ্তাহিক ২০০০ প্রকাশিত হয়। এটিও এসব ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি গঠনেও অগ্রণী ভূমিকা ছিল। একাত্তরের দালালেরা কে কোথায় তার তালিকা বিচিত্রায় ছাপিয়ে শাহাদত চৌধুরী মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষ চেতনার বিরুদ্ধে ভূমিকা নিয়েছিল

আমাদের দেশে এখন সংকটময় মুহূর্ত চলছে। জঙ্গিবাদের বিষাক্ত ছোবলে রক্তাক্ত হচ্ছে এ দেশ। এই সংকটপূর্ণ সময়ে তার চলে যাওয়াটা বলতে হয় অকালেই। তার সম্পাদিত পত্রিকা সব সময় দেশের সংকট মোচনে সাহায্য করতো। আজকে বাংলাদেশে যে ইসলামী জঙ্গিবাদের উত্থান, শাহাদত চৌধুরী সাপ্তাহিক ২০০০-এর মাধ্যমে এ জঙ্গিবাদ সম্পর্কে অনেকবার সতর্ক করে দিয়েছেন। শাহাদত চৌধুরী বেঁচে থাকলে জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে তিনি যে সাপ্তাহিক ২০০০-এর মাধ্যমে সংকট মোচনে ভূমিকা রাখতেন তাতে সন্দেহ নেই। তার পত্রিকা লেখার মাধ্যমে, রিপোর্টের মাধ্যমে, অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের মাধ্যমে এই জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে বরাবরই ভূমিকা রেখেছে। তাছাড়া দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে যে জঙ্গি প্রশিক্ষণ চলছে সে সম্পর্কে প্রতিবেদন প্রকাশ করেও শাহাদত চৌধুরীর পত্রিকা সাপ্তাহিক ২০০০ দেশ ও জাতিকে সতর্ক করেছে। এই সংকটময় মুহূর্তে তার চলে যাওয়াটা অকালেই বলতে হয়। শাহাদত চৌধুরী বেঁচে থাকলে এসব জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে তার নেতৃত্বে সাপ্তাহিক ২০০০ যে জোরালো ভূমিকা রাখতো তাতে জাতি উপকৃত হতো।